রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাবিভাগীয় পত্রিকা

বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা

সূচিপত্র

জার্মান কবি রিলকে	রামেশ্বর শ'	১
বক্রোক্তিবাদ	কাননবিহারী গোস্বামী	২৩
বিস্মৃতপ্রায় 'স্বপ্নপ্রয়াণ'	নন্দদুলাল বণিক	২৯
বঙ্গে বর্গী : 'পুরাণ' নয়, ইতিহাস	মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায়	৩৮
বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি : জীবনানন্দ ও জসীমউদ্দিন	শ্রাবণী পাল	৫১
ভালোবাসার অনধিকার	জ্যোৎস্না চট্টোপাধ্যায়	৬৪
'সোনালী কাবিন' সনেট চতুর্দশীতে চেতনার মাত্রান্তর	বিকাশকান্তি মিদ্যা	৭১
'পত্রপুট'-এর কবি	দেবলীনা মুখোপাধ্যায় (শেঠ)	৮১
বাংলা কবিতা আর কাব্যতত্ত্ব নিয়ে নতুন ভাবনার প্রস্তাবনা	অরূপকুমার দাস	৯২
বাংলা কবিতা : বিবর্তনের মুখোমুখি	নারায়ণ হালদার	৯৮
নজরুলের কবিতায় আরবী-ফারসী শব্দ: সাহিত্যিক বিতর্ক এবং রবীন্দ্রনাথ	প্রত্যুষকুমার রীত	১২৫
বিষ্ণু দে-র কবিতায় মিথ ও পুরাণের প্রতীক প্রতিমা	বাঁশরী রায়চৌধুরী	১৩২
'ক্ষুধার রাজ্যে কবিতা গদ্যময়'	দীপেশ মণ্ডল	১৪২
তারাশঙ্করের ত্রিপত্র : মহাকবির আদিকাব্য	আশিস্ কুমার নায়ক	১৪৭
বিভাগীয় সংবাদ		১৫৫

বাংলা কবিতা : বিবর্তনের মুখোমুখি

. . . . . .

নারায়ণ হালদার

১

কবিতা কি তা বলা বেশ শক্ত। তবে আলোচনার খাতিরে মোটের উপর বলা যায় যে—কবি আত্মদলনের হাত থেকে মুক্তির জন্য কল্পনাময় অনুভববেদ্য স্বকীয় জীবনসত্যের যে ভাষিক রসমূর্তি সৃষ্টি করেন তা-ই হল কবিতা। এবারে প্রশ্ন হতে পারে তবে কবি কে? এর উত্তর কঠিন। তবু সংক্ষেপে বলা যেতে পারে—যাঁর কবিত্বশক্তি আছে। এখন আবার নতুন সমস্যা দেখা দিতে পারে কবিত্বশক্তি কি? এর সাদামাটা উত্তর আমরা হাজির করতে পারি যে, প্রত্যক্ষদৃষ্ট বস্তু থেকে অপ্রত্যক্ষগোচর সত্য, বস্তু থেকে ভাবরসের আবিষ্কারী ক্ষমতা হল কবিত্বশক্তি। কেউ প্রশ্ন করতে পারেন এই ক্ষমতা কিভাবে কার মধ্যে সঞ্চারিত হয়? উত্তরে বলা যায় যাঁর সদাজাগ্রত ইন্দ্রিয়, অসীম অনুভব-উপলব্ধি শক্তি ; যিনি সৃজনশীল কল্পনা, বিপুল অভিজ্ঞতা, গভীর বোধ ও বোধির অধিকারী তিনিই এই ক্ষমতার অধিকারী। জীবনানন্দ দাশ এই কবিত্বশক্তির অধিকারীর বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন—

> "কবি—কেননা তাদের হৃদয়ে কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা রয়েছে এবং তাদের পশ্চাতে অনেক বিগত শতাব্দী ধরে এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতের নব নব কাব্য-বিকীরণ তাদের সাহায্য করছে।.... যাদের হৃদয়ে কল্পনা ও কল্পনার ভিতরে অভিজ্ঞতা ও চিন্তার সারবত্তা রয়েছে তারাই যাহায্য প্রাপ্ত হয়; নানা রকম চরাচরের সম্পর্কে এসে তারা কবিতা করবার অবসর পায়।"[১]

কবিতা সৃষ্টি হয় বাস্তব জগতের উপাদান বা উপকরণে। তবে যে-কোন বাস্তব ঘটনা, উপাদান বা উপকরণই কবিতার বিষয় হতে পারে না। আমাদের নিত্যদিনের অভিজ্ঞতার মধ্যে যেগুলো অনন্য, অপূর্ব, যা আবেগ-অনুভূতি স্বজ্ঞাকে আলোড়িত করে, কবিহৃদয়কে নিরন্তর আত্মপ্রকাশের যন্ত্রণায় বিদ্ধ করে, তা-ই কবিতার বিষয় হয়ে উঠে। এই বিশেষ অভিজ্ঞতা কবির সামনে প্রতিভাত সমাজপ্রতীতিজাত অভিজ্ঞতা, যা কবি-হৃদয়ে বিশেষ অনুভূতির সঞ্চার করে, কবিকে আলোড়িত করে, এবং তা কবির নিজস্ব বোধবোধি সঞ্জাত হয়ে কল্পনার সৃজনী আলোকে স্বকীয় জীবনসত্য রূপে কবিতায় প্রকাশিত হয়ে ওঠে।

২

বিবর্তনের মূল ধর্ম স্থূল থেকে ধীরে ধীরে সূক্ষ্মতর হওয়া, সঙ্কীর্ণ জীবনগণ্ডী থেকে বহুবিস্তৃত ব্যাপ্ত ক্ষেত্রে উপনীত হওয়া, জড়ধর্মকে অতিক্রম করে প্রাণধর্মের পূর্ণপ্রতিষ্ঠায় অবস্থান করা, পাদভূমি থেকে উন্নতির চূড়ায় পৌঁছান। এই বিবর্তন দ্বিমুখী হতে পারে—উর্ধ্বমুখী

উত্তরণ (Vertical Movement) এবং পার্শ্বমুখী সম্প্রসারণ বা আনুভূমিক বিস্তার (Horizontal Movement)। বাংলা কবিতার বিবর্তনের ধারাটি এই দ্বিবিধ খাতে প্রবাহিত। বাংলা কবিতার বিষয়বৈচিত্র্য, শিল্পাঙ্গিক ও মনোধর্মের যেমন ঊর্ধ্বায়ন ঘটেছে, তেমনই আঞ্চলিক সীমার গণ্ডী ধীরে ধীরে মুছে গেছে। আনুভূমিক বিবর্তনে বাংলা কবিতা তার বিষয়বস্তুর আঞ্চলিক পরিসীমা, ধর্মীয় গোষ্ঠীবদ্ধ চেতনা অতিক্রম করে যেমন আবিশ্বের বাস্তব জীবন সত্যের অভিমুখে যাত্রা করেছে তেমন মরমীয় উপলব্ধির গভীরতাকে ধারণ করেছে। প্রাথমিকভাবে আমাদের চিন্তাচেতনা ও শিল্পবোধ ধর্ম ও অলৌকিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল—যুক্তি বুদ্ধির পরিবর্তে অহেতুক বিশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত ছিল। বাস্তবদৃষ্ট সত্যের তুলনায় অদৃষ্ট, কাল্পনিক জগৎ শ্রেয় বলে স্বীকৃত হয়েছিল। ধর্মীয় বোধ কবিদের যুক্তি বুদ্ধি বিচক্ষণতা মননশীলতা বোধবোধির আলোক শিখাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তখন কবিগণ গোষ্ঠীগত চিন্তাচেতনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতেন, তাঁদের স্বকীয়তা ততটা প্রকাশিত হতে পারে নি। ধীরে ধীরে বাংলা কবিতার আত্মার আমূল পরিবর্তন দেখা গেল, চেতনার ঊর্ধ্বায়ন ঘটল। শ্রীঅরবিন্দ কাব্যক্ষেত্রে কবিচেতনার এই ঊর্ধ্বমুখী বিবর্তনের স্বরূপকে সুন্দররূপে বিশ্লেষণ করে বলেছেন—

> ''আমাদের সত্তার প্রতিটি অংশের গভীরতায়, আমাদের ইন্দ্রিয়, হৃদয়, মন, প্রাণের মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটি বোধিচেতন ব্যক্তি-আত্মাই হল ঊর্ধ্ব থেকে অবতীর্ণ সেই কাব্যবাণীর বিতরণের আধার। এই বোধি-চেতন ব্যক্তি-আত্মা হল অন্তরের কোন গোপন গুহায় লুক্কায়িত একটি ঊর্ধ্বমুখী শক্তি। এই গোপন গুহার স্ফটিক-দ্বারে যে পর্দাটি ঝুলছে তার ফাঁক দিয়ে কখনো কখনো একটু-আধটু উপরের জিনিসটি দেখা দেয়, কখনো-বা সে দরজা আংশিক খুলে যায়, কখনো-বা তার কপাট থাকে শুধুই ভেজানো—''নিহিতং গুহায়াম্, গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠম্।''... সাম্প্রতিক কালের কবিতার সবচেয়ে বিশিষ্ট প্রবণতাটিই হল, সেই জ্যোতির্ময় গহ্বরটির দ্বার-উন্মোচনের চেষ্টা, আমাদের বুদ্ধি, কল্পনা, ইন্দ্রিয়ানুভূতি, প্রাণশক্তি ও অনুভূতির অন্তর্নিহিত এই বোধিচেতন আত্মিক স্বরূপটির সাক্ষাৎ দর্শন এবং তার উপযোগী ভাষাভঙ্গি লাভ করার সাধনা।''[২]

৩

বাংলা কবিতার জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত ধারাবাহিক বিবর্তনের মোটামুটি সুদীর্ঘ বারশো বছরের ইতিহাসের দিকে তাকালে ঊর্ধ্বমুখী ও আনুভূমিক বিবর্তনের রেখাচিত্রটি স্পষ্ট হয়। বাংলা কবিতার বিবর্তনের সূচনা ধর্মকে অবলম্বন করে। বাংলা ভাষার প্রাচীনতম (আনুমানিক ৮ম-১০শ শতকের রচনা) গ্রন্থ ''চর্যাগীতিকোষ'' বৌদ্ধ সহজিয়া তান্ত্রিকদের সাধনতত্ত্ব ও ধর্মদর্শনের রূপায়ণ। বাস্তব জগতের অভিজ্ঞতার আড়ালে এখানে প্রধান হয়ে উঠেছে কবিদের দার্শনিক ও ধর্মীয় অনুভব-অনুভূতি এবং সত্যোপলব্ধি। কেননা তখন সমাজজীবনে ধর্মের প্রভাব ছিল অতি প্রবল—ধর্মের গণ্ডীকে অতিক্রম করে ব্যক্তিসত্তার প্রকাশ সম্ভব ছিল না। তাই প্রাচীন যুগের কবিদের কাব্যে মানুষ নয়, ধর্মই মুখ্য বিষয় হয়ে

উঠেছিল। আর তখন বাঙালীর চিন্তা ও চেতনার জগৎ ছিল ধর্মীয় আবেষ্টনীতে সীমাবদ্ধ। চর্যাপদই বাঙালীমনন ও চিন্তার প্রাথমিক রূপ, যেখানে অলৌকিকতা, কল্পনা, ধর্ম ও বাস্তবজীবন একত্রে সমন্বিত।

৩.১

বাংলা কবিতার আঙ্গিকের দিক থেকে ''চর্যাগীতিকোষ''-এর কবিতাগুলো ছিল মূলত খণ্ডকবিতা; আকারে ক্ষুদ্র, একটি নিটোল ভাবের আধার, সঙ্গীতধর্ম তার প্রাণ। এ কবিতার শরীরে মুদ্রিত রাগরাগিণী। প্রতিটি কবিতা দুটি ধ্রুবপদের সমন্বয়ে গঠিত, আট থেকে চোদ্দ পঙ্‌ক্তির সজ্জায় বিন্যস্ত। এখানে দুটি চরণে একটি ভাব সুচারুরূপে প্রকাশিত হয়েছে। এর গঠন বেশ সংহত, সুচারু, শিল্পিত; সনেটের প্রাথমিক আদল এখানে ফুটে উঠেছে। বাংলা ভাষার প্রাথমিক পর্বে যা অকল্পনীয়। ছন্দের প্রবাহে ছিল পয়ারের প্রাথমিক আভাস। চর্যাপদের অন্ত্যমিলের বিন্যাসে যে বৈচিত্র্য দেখা যায় সমগ্র মধ্যযুগে তা অনন্য। প্রতিটি অন্ত্যমিল নতুন, পুনরাবৃত্তি ঘটানো হয় নি, মধ্যযুগে ক্রিয়াপদের মাধ্যমে একঘেয়ে অন্ত্যমিল রচনা এই কাব্যে দেখা যায়। কিন্তু প্রাচীনকালে ক্রিয়াপদ ছাড়াও বিশেষ্য বিশেষণপদের অন্ত্যমিল ব্যবহৃত হয়েছে। কবিতাগুলো একোক্তিমূলক বলেই নাট্যগুণ ভালো জমে ওঠে নি। এখানে সামান্য চরিত্রের আভাস আছে। এর ভাষায় আছে সচেতন শিল্পপ্রয়াস, কবিগণ সমাজসচেতন থেকেও সংস্কৃত ও মৌখিকরূপের সমন্বয়ে সাংকেতিক সান্ধ্যভাষার মাধ্যমে নতুন কাব্যভাষা নির্মাণ করে গীতিগুলো রচনা করেছেন।

৪.০

বাংলা কবিতা অলৌকিকতাকে অস্বীকার করে বাস্তব সমাজব্যবস্থা ও জীবনজিজ্ঞাসার আলোকে মানবের মূল্যায়নে চেতনার দ্বিতীয় স্তরে পৌঁছল চতুর্দশ শতকের ''শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'' কাব্যে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে বাঙালীমনন ও চেতনার বিস্তর পরিবর্তন দেখা দিল। কাব্যে ধর্মের পাশাপাশি মানুষও স্থান পেল। এখানে মানুষ মুখ্য আধার, তবে মানবস্বরূপে দেবত্ব আরোপের প্রচেষ্টা দেখা যায়। এ-কাব্যে বড়ু চণ্ডিদাস লৌকিক আখ্যানকে পুরাণের সমর্থনে চিত্রিত করেছেন। এখানে ধর্ম আছে কিন্তু তত্ত্ব বা দার্শনিকতার স্থান নেই। রাধা কৃষ্ণ বড়াই সকলেই মর্মে, প্রাণধর্মে মানবী, বাহ্য আবরণে রাধা-কৃষ্ণ দেবতা। খানিকটা জোর করেই কৃষ্ণ দেবত্বকে প্রচার করেছে, রাধা ও বড়াইয়ের কাছে। তবে এ-কাব্যে লৌকিক জীবনবোধ পৌরাণিক ধর্মীয় চেতনার ঊর্ধ্বে স্থিতি লাভ করেছে।

৪.১

আদিমধ্যযুগের আখ্যানকাব্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রতিপাদ্য বিষয় দুটি নরনারীর হৃদয়ের আকর্ষণ-বিকর্ষণ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত। প্রচলিত সমাজজীবনের প্রথা-রীতি-নীতি-সংস্কারের বন্ধনের আলোকে রাধা ও কৃষ্ণের অন্তর্দ্বন্দ্বকে চিত্রিত করেছেন বড়ু চণ্ডিদাস। পৌরাণিক ধর্মীয় আদর্শ, দর্শন ও তত্ত্ব এর মুখ্য বিষয় নয়। তবে বৈষ্ণবধর্ম ও দর্শনের প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক প্রচেষ্টা দেখা

যায় এই কাব্যে। লৌকিক জীবনধর্মমুখ্য এই কাব্যে লোকায়াত ভাবনা স্থান পেয়েছে। মধ্যযুগের অন্যান্য আখ্যানকাব্যের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের আখ্যানধর্মের পার্থক্য বিদ্যমান। এখানে ছোট ছোট ভাবনির্ভর কবিতাকে পরপর সাজিয়ে আখ্যানের সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পরবর্তীকালের আখ্যানকাব্যে দীর্ঘ কাহিনী নির্ভর কবিতার মাধ্যমে ঘটনাগত সংযোগ সাধিত হয়েছে। রামায়ণ-মহাভারত-মনসামঙ্গল-চণ্ডিমঙ্গল-ধর্মমঙ্গল-শিবমঙ্গল-অন্নদামঙ্গল-এর কাহিনীর বিষয় বিন্যাসকে পর্যালোচনা করলেই তা বোঝা যাবে। বাংলা সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এই কাব্যে প্রথম রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে অবলম্বন করে পরিপূর্ণ নিটোল কাহিনী নির্মাণ করা হয়েছে। বড়ু চণ্ডিদাস রাধা চরিত্রের পূর্ণাঙ্গ রূপদান করেছেন। বৈষ্ণবপদাবলীর ভাবসম্পদ এই কাব্যের মধ্যেই নিহিত আছে। রাধা চরিত্রের বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রথম মনঃসমীক্ষণ রীতির সার্থক প্রয়োগ ঘটান বড়ু কবি।

৪.২

বাংলা ভাষার দ্বিতীয় কাব্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আঙ্গিকে এলে পরিবর্তন। খণ্ডকবিতা পরিবর্তিত হল আখ্যানধর্মী পালায়। বিরাট একটি কাহিনী ১৩টি খণ্ডে নানা ছোট বড় কবিতার মাধ্যমে রূপায়িত হল। এখানেও প্রতিটি কবিতায় রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে, আছে ধ্রুবপদের প্রয়োগও। তবে এখানে প্রতিটি কবিতায় একটি ধ্রুবপদ ব্যবহৃত হয়েছে। কবিতায় পঙ্‌ক্তির সংখ্যা ১০ থেকে ১৬। ছন্দ হয়ে উঠেছে ভাবানুসারী, ছন্দে বৈচিত্র্য এসেছে, পয়ারের প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি ত্রিপদী, একবলী ইত্যাদি ছন্দেও পদ রচিত হয়েছে। এখানেও কবি কবিতার নিটোল ভাবরূপকে অস্বীকার করেন নি। কেননা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যও চর্যাপদের মতো কাহিনী প্রধান নয়,—যদিও একটি কাহিনী আছে—ভাবপ্রধান। এ কাব্যে প্রথম এসেছে নাটকীয়তা। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে এসেছে ঘাতপ্রতিঘাতমূলক দ্বন্দ্ব মুখর কাহিনী, এসেছে সংলাপ ও চরিত্র। এই কাব্যের বর্ণনাভঙ্গিতে আছে বিবৃতিমূলকতার পাশাপাশি বিশ্লেষণমূলকতা। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে রাধা চরিত্রটিকে ধীরে ধীরে উন্মোচিত করেছেন বড়ু চণ্ডিদাস। এই মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ রীতি পরবর্তীকালে প্রযুক্ত হতে দেখি মনসামঙ্গল কাব্যের কবি বিজয়গুপ্তের কাব্যে। তিনিও মনসা চরিত্রের দ্বন্দ্বকে মনঃসমীক্ষণ প্রক্রিয়ায় উন্মোচিত করেছেন। চর্যাপদে রূপক ও উপমা অলঙ্কার মুখ্য, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এর পাশাপাশি উৎপ্রেক্ষা সমাসোক্তি অলঙ্কারের প্রয়োগ দেখা গেল।

৫.০

ধর্মতত্ত্ব ও ভক্তিভাব প্রচারের সচেতন প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয় মধ্যযুগের অনুবাদসাহিত্য—রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতে। অনুবাদকাব্য মূলত মুসলমান সম্প্রদায়ের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সমাজসচেতন বুদ্ধিজীবী বাঙালী হিন্দুদের এক মানসিক প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের কাব্য—বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত, অসংহত বাঙালীজাতির মহামিলনের কাব্য। কাব্যগুলো অনূদিত হয়েছে প্রাচীন মহাকাব্য অথবা পুরাণ থেকে। কৃত্তিবাস রামায়ণে বাল্মীকিকে গ্রহণ, বর্জন, রূপান্তর ও নবসৃজনের মাধ্যমে বাঙালী মানসের উপযুক্ত ভাবপরিমণ্ডলের বিষয় হিসেবে

তুলে ধরলেন। তিনি তৎকালীন বাঙালী জীবনের মর্মস্থিত ধর্মবোধ ও ভক্তিভাবকে তুলে ধরেছেন এই কাব্যে। ভক্তিভাবের পাশাপাশি তিনি সমকালীন সমাজবাস্তবতাকেও রূপায়িত করেছেন। অন্যদিকে সংস্কৃত মহাভারতকে বাঙালীর জীবন-প্রবাহের সঙ্গে সংপৃক্ত করলেন কাশিরাম দাস। ধর্মের জয়, অধর্মের পরাজয়—এই নীতিকথাই প্রচারিত হয়েছে কাশিদাসি মহাভারতে।

৫.১

পৌরাণিক আদর্শ, ধর্মবোধ ও নীতিকথা প্রচারের জন্য অনূদিত রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত। এই কাব্যে হিন্দুধর্মের মূলকথা তত্ত্ব-ধর্ম-দর্শন নানাভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। এর শরীরে পুরাণের আদল থাকলেও মর্মে আছে লোকজীবন ও লোকধর্মের প্রকাশ। এই কাব্যগুলোর মূলকথা ধর্মের জয় অধর্মের পরাজয়, সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস অসৎ সঙ্গে নরকবাস। ফলে এর কাহিনীতে অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ ও ভক্তিরসের দুর্বার প্রবাহ দেখা যায়। অনুবাদকাব্যে বাঙালী মনন ও চিন্তার জগৎ বাস্তবতা ও অলৌকিকতায় মাখামাখি। যুক্তি ও ভক্তির দোলাচলতায় ভক্তিই ধর্মের বেশে স্থান পেয়েছে।

৫.২

অনুবাদমূলক সাহিত্যে কবিতার সংগঠনে দেখা দিল রূপান্তর। কবিতাগুলো কাহিনীমুখ্য হয়ে উঠল। ভাবগত সংঘাতের পরিবর্তে ঘটনাগত দ্বন্দ্ব প্রধান হল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের কাহিনীর সঙ্গে এদের কাহিনীর প্রধান পার্থক্য হল—শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাহিনীতে ঘটনা মুখ্য ছিল না, ভাব মুখ্য, এখানে ভাব নয় ঘটনা মুখ্য। অনুবাদকাব্যে পাঁচালীর ঢঙে একটি নির্দিষ্ট রচনাশৈলীকে অনুসৃত হতে দেখা যায়। এখানে ধ্রুবপদ প্রায় উঠে গেল। কবিতাতে কোথাও রাগরাগিণীর উল্লেখ থাকল কোথাও থাকল না। উপস্থাপন-রীতিতে এল বিবৃতিমূলকতা, নাটকীয়তা, পাঁচালীর ধর্ম, কথকতার গুণ। ছন্দ ও অলঙ্কারে বিশেষ নতুনত্ব না থাকলেও কৃত্তিবাস ওঝা লৌকিকজীবন থেকে অলঙ্করণের উপকরণ চয়ন করে তাঁর কাব্যকে জীবন্ত করে তুলেছেন।

৬.০

তুর্কি-আক্রমণ (১১৯৯-১২০৫) বাঙালীর জীবন ও সংস্কৃতিতে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। যখন বাঙালী হিন্দুরা ধর্মীয় গোঁড়ামি, সামাজিক ভেদাভেদে বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত; তাদের আদর্শ, নৈতিকতা, মূল্যবোধ তলানিতে পৌঁচেছে, তখন মুসলমানের আঘাতে বাঙালী হিন্দুর চিত্ত চঞ্চল হয়ে পড়ে। মুসলমানের আগ্রাসী থাবা থেকে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করার জন্য আত্মবিস্মৃত বাঙালী আত্মসচেতন হয়ে ওঠে। স্বধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়। আর তখনই সামাজিক সমন্বয়ের মূলমন্ত্রকে প্রচার করতে সৃষ্টি হয় সমৃদ্ধ মঙ্গলকাব্যের স্বতন্ত্র ধারা। রচিত হয় মনসামঙ্গল, চণ্ডিমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, শিবমঙ্গল, কালিকামঙ্গল, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি মঙ্গলকাব্য। লৌকিকজীবন ধারার সঙ্গে অভিজাত জীবন

প্রবাহের মেলবন্ধন রচিত হল এই কাব্যশাখাতে। লৌকিকজীবনসম্ভূত স্বতন্ত্র অনার্য ধর্মীয় চেতনার সঙ্গে আর্য পৌরাণিক ধর্মীয় ভাবনার একাত্মীকরণ মঙ্গলকাব্যের উদ্দেশ্যে পরিণত হয়। বিচ্ছিন্ন বাঙালী সমাজকে ঐক্যবদ্ধ, উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্গের ভেদকে দূর করার প্রচেষ্টা দেখা যায়।

৬.১

আঞ্চলিক ব্যাপ্তিতে ও বিষয় বৈচিত্র্যে মঙ্গলকাব্য বাংলা সাহিত্যের বিবর্তনকে অনেকটা তরান্বিত করল। বিজয় গুপ্ত কাহিনী বয়নে, উপস্থাপন কৌশলে, বিশ্লেষণভঙ্গিতে বিশেষ কৃতিত্বের সাক্ষর রেখেছেন। তিনি নতুনতর শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দের সার্থক প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। তিনি সচেতন শিল্পদৃষ্টির অধিকারী—প্রথম সাহিত্যসমালোচক। নারায়ণদেব মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনায় গভীর জীবনোপলব্ধিকে রূপায়িত করেছেন তাঁর পদ্মাপুরাণে। তিনিই প্রথম অনুপুঙ্খ বিবরণের মাধ্যমে রাঢ়ভূমির প্রত্যক্ষ রূপকে তুলে ধরলেন। আর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারা আধুনিক কালের কথাসাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচিত করায়। এই মৌলিক সাহিত্যশাখায় বাঙালী কবি উপন্যাসের প্রধান গুণ—নিপুণ পর্যবেক্ষণ শক্তি, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে গভীর প্রত্যয়, ব্যাপক অভিজ্ঞতা ও গভীর সহানুভূতি তা প্রথম প্রত্যক্ষিত হতে দেখা যায় মুকুন্দরামের কাব্যে। এ-সম্পর্কে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—"মুকুন্দরামের 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী'তে স্ফুটোজ্জ্বল বাস্তবচিত্রে, দক্ষচরিত্রাঙ্কনে, কুশল ঘটনাসন্নিবেশে, সর্বোপরি, আখ্যায়িকা ও চরিত্রের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ও জীবন্ত সম্বন্ধস্থাপনে, আমরা ভবিষ্যৎকালের উপন্যাসের বেশ সুস্পষ্ট পূর্বাভাস পাইয়া থাকি।"[৩]

৭.০

বৈষ্ণবপদাবলীতে বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের পাশাপাশি গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ও ধর্মমতের প্রকাশ দেখা যায়। এখানে মানবীয় জীবন-সংগ্রামের অতন্দ্রতায় ঈশ্বরসাধনার স্বরূপকে ভক্তকবিগণ কাব্যরূপ দিয়েছেন। কবিগণ মানবিক পার্থিব প্রেমের আলোকে ঐশ্বরিক প্রেমের নান্দনিকতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। বৈষ্ণবকবিদের লেখনীতে দেবতা হয়ে উঠেছেন মানব, মানব হয়েছে দেবতা। বাস্তবতা, গভীর জীবনাভিজ্ঞতা ও মানবতা বৈষ্ণবপদাবলীকে ঋদ্ধ করেছে। এখানেই প্রথম শুনতে পেলাম মানবতাবাদের সোচ্চার ঘোষণা—

"শুনহ মানুষ ভাই।
সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই॥" (চণ্ডিদাস)

রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ শ্রীচৈতন্যের (১৪৮৬-১৫৩৩) পার্থিব ও অলৌকিক জীবনের রূপায়ণের মাধ্যমে বৈষ্ণবকবিগণ প্রথম বাংলা সাহিত্যে মানবায়ন ঘটান। ধর্মীয়-চেতনাসর্বস্ব মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে প্রথম রক্তমাংসে-গড়া পার্থিব মানুষ সাহিত্যে নায়কের আসন লাভ করল। তাঁকে নিয়ে সৃষ্টি হল নতুন নতুন সাহিত্য শাখা—গৌরাঙ্গবিষয়কপদ-গৌরচন্দ্রিকা-জীবনীসাহিত্য। আত্মপ্রকাশ করল নব নব রস ও রসসাহিত্য—সাহিত্য মূল্যায়নের দৃষ্টিভঙ্গি। তাঁর প্রচারিত প্রেমপূর্ণ ভক্তিভাব পরবর্তী

সমগ্র মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের চরিত্রকে প্রভাবিত ও রূপান্তরিত করেছিল। হিংস্র-ক্রুর প্রতিহিংসাপরায়ণ দেবদেবী চৈতন্যদেবের প্রভাবে স্নেহ-মায়া-মমতায় শান্ত ও মানবিক হয়ে উঠেছেন।

৭.১

বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্যে খণ্ডকাব্যের ধারার শিল্পরূপ প্রতিষ্ঠা পেল। চর্যাপদে যার সূচনা এখানে তার নান্দনিক সত্তার প্রতিষ্ঠা। এখানে বিশেষ বক্তব্য বা ঘটনা প্রধান নয়, একটি ভাবই প্রধান। এই কাব্যধারার মাধ্যমে বাংলা কাব্যভাষা ব্রজবুলির ঐশ্বর্যে ঋদ্ধ হয়ে উঠল। আবিষ্কৃত হল নতুন কাব্যশৈলী। এই বৈষ্ণবপদাবলীতেই ধ্বনিঝঙ্কার, পদলালিত্য, ছন্দঃস্পন্দন, ভাবপ্রবাহ, গতি বাংলা কাব্যের জগৎকে সমৃদ্ধ করেছে। আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথ এই কাব্যশৈলীর মোহ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেন নি। তার প্রামাণ 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'। বাস্তবতা ও অলৌকিকতার সহাবস্থান এই কাব্যধারাতে বিদ্যমান। রোমান্টিক উপলব্ধি ও মিস্টিক অনুভব প্রথম বাংলা কবিতার শরীর ও সত্তায় সঞ্চারিত হল এই কাব্যশাখাতে। এই কাব্যধারাতে বাঙালী কবির চেতনা সূক্ষ্মতম, গভীরতম হয়েছে। এখানেই মননশীলতা, প্রজ্ঞা ও স্বজ্ঞার প্রাথমিক উৎস ও বিকাশও পরিলক্ষিত হয়। বর্ণনাভঙ্গিতে আত্মতন্ময়তা থাকলেও কোথাও কোথাও বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গির সাক্ষাৎও মেলে।

৮.০

অষ্টাদশ শতকের আরাকান রাজসভার কবিগণ সৈয়দ আলাওল, দৌলত কাজী প্রমুখ মধ্যযুগের সাহিত্যের বিষয়বস্তুতে বৈচিত্র্য ও অভিনত্ব আনলেন। কাব্যের বিষয়বস্তু আঞ্চলিকতা ও প্রচলিত ধারাকে অতিক্রম করে গেল। তাঁরাই প্রথম ধর্মের গণ্ডীকে অতিক্রম করে বাস্তবের নরনারীর জীবনের নানা টানাপোড়েনকে কাব্যের উপকরণরূপে তুলে ধরলেন। বাস্তব জীবন সমর্থিত রোমান্টিক প্রণয়ের ধারার শুভ সূচনা ঘটে তাঁদের হাতে। তাঁরাই প্রথম মধ্যযুগের গতানুগতিক কাব্যবিষয়ে বৈচিত্র্য আনেন, বাংলা শব্দভাণ্ডারকে আর্বি-ফার্সি শব্দের দ্বারা সমৃদ্ধ করে তোলেন। বাংলা সংস্কৃতির সঙ্গে মুসলমান সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ সংযোগ সাধন করেন। লোকায়ত জীবনসংস্কৃতির সঙ্গে মুসলমান ধর্মের একটি সূক্ষ্ম সংযোগ সূত্র রচিত হয়।

৯.০

গার্হস্থ্য জীবনের রূপায়ণ ঘটেছে শাক্তকবিদের গানে। দেবতা-মানবে আলাপন বাৎসল্য রসের নতুন রাগিণীতে ধ্বনিত হয়েছে। সাধনক্ষেত্রকে সংসারক্ষেত্রে স্থাপন করে ধর্মকে জীবনেরই অন্যরূপ বলে ঘোষণা করেছেন 'মায়ের সন্তানগণ'। ঐকান্তিকতা, আত্মমগ্নতা, আত্মনিবেদনের চরম প্রকাশ তাঁদের কবিতায়। গীতিকবিতার গীতিধর্ম অভিনব সুরে ধরা পড়ল শাক্তপদাবলীতে। মিস্টিক অনুভব শাক্তপদাবলীর শরীরে সঞ্চারিত হয়েছে। শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দের শিল্পরূপটি সার্থকরূপে প্রতিষ্ঠা পেল শাক্তকবির হাতে।

১০.০

মধ্যযুগের শেষপর্বে এসে ভারতচন্দ্রের (১৭১২-১৭৬০) হাতে বাংলা কাব্যের নবকাব্যশৈলী নির্মিত হয়। তিনি প্রথম ধর্মীয় বিশ্বাসের জগৎ থেকে কবিচিত্তকে মুক্ত করতে পেরেছিলেন। ধর্মের দাসত্ব নয়, মানুষের কথা, সমকালীন বাস্তব জীবন-সমস্যার কথা, ইতিহাসের কথা তুলে ধরলেন তিনি 'অন্নদামঙ্গলকাব্যে'। তাঁর হাতেই বাঙালীর চেতনা হল সমাজমুখী; ইতিহাস, ঐতিহ্য ও কল্পনার সমন্বয়ে গঠিত হল কাব্যের ভাববস্তু। কিন্তু ভারতচন্দ্র রূঢ় বাস্তবকে সম্পূর্ণরূপে তুলতে পারেন নি, দৈব্য বিশ্বাস, অলৌকিকতা থেকে চেতনার ধারাকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেন নি। তবে আধুনিক জীবনবোধে আত্মসঙ্কটের সঙ্গে জাতীয় সঙ্কটের উত্থাপনে, কল্পনার স্বাধীনতায় তিনিই প্রথম বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার উৎসমুখ খুলে দিলেন।

১০.১

যথার্থ শিল্পসচেতন, যুগসচেতনা কবি হলেন ভারতচন্দ্র। তিনি বাংলা কাব্যে ভাবে ভাষায় আঙ্গিকে উপস্থাপন ও বিশ্লেষণরীতিতে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি সঞ্চার করেন। বাংলা কাব্যধারায় বুদ্ধিপ্রধান, মননঋদ্ধ সাহিত্যের প্রচার শুরু হল। ভাষাশৈলীতে বিবৃতিমূলকতা স্থান পেল, ভাষা হয়ে উঠল বাস্তববাদী। তাঁর কাব্যে বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের শব্দের পাশাপাশি মান্য সংস্কৃতের ও আর্বি-ফার্সি শব্দের প্রয়োগ দেখা গেল। আধুনিক যুগচিন্তার প্রথম কাণ্ডারী ভারতচন্দ্রের কাব্যে দেখা দিল ভাষার কারুশিল্পের নান্দনিকতা। ভাবৈশ্বর্যে তাঁর কাব্য অনন্য হয়ে উঠল। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দের মাধ্যমে কাব্যে নতুনত্ব সৃষ্টি করেছেন। ভারতচন্দ্রের কাব্যে বাংলা ছন্দের সাম্রাজের বিস্তার ঘটেছে। তিনি সংস্কৃতের ছন্দ-ভাণ্ডারের ঐশ্বর্যে বাংলা ভাষার ছন্দ-ভাণ্ডারকে ঋদ্ধ করেছেন। তিনি সার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন—ভুজঙ্গ প্রয়াত, তূণক, মালঝাঁপ, চৌপদী ইত্যাদি সংস্কৃত ছন্দ। ভারতচন্দ্র প্রচলিত ছন্দোরীতিতে আনলেন নতুনত্বের স্বাদ। তিনি সংস্কৃত ছন্দের পাশাপাশি বাংলা ছন্দের নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করলেন। অনুপ্রাস, যমক, উৎপ্রেক্ষা, সমাসোক্তি, উপমা অলঙ্কারের নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রয়োগ সূচিত হল তাঁর কাব্যে। তবে তা সংস্কৃতের অনুবর্তন মুখ্য।

১১.০

যুগসন্ধিক্ষণের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব মূর্ত হয়ে ওঠেছে ঈশ্বর গুপ্তের (১৮১২-১৮৫৯) কাব্যে। তাঁর কাব্যেই প্রথম দেখা গেল আধুনিক চিন্তা-চেতনার আলোকে সচেতনাভাবে ধর্মের গণ্ডী অতিক্রম করে পরিপূর্ণ বাস্তব জীবনবোধের কথা স্থান পেতে। তিনি তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়কে কাব্যে স্থান দিলেন। প্রথম বাঙালী চেতনায় নিত্যদিনের দর্শনযোগ্য বস্তুর উপর গুরুত্ব আরোপিত হল। তাঁর মাধ্যমে চেতনা প্রথম বস্তুনিষ্ঠ হল। সমকালীন যুগচেতনা ও শিল্পীর জীবনদর্শন প্রথম প্রকাশিত হতে দেখা গেল ঈশ্বর গুপ্তের খণ্ডকবিতায়। তাঁর হাত ধরে

বৈজ্ঞানিক যুক্তিবুদ্ধি, মনন, বাস্তব অভিজ্ঞতা কবিতায় এল। তবে প্রাচীনপন্থীয় সংস্কার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তাঁর শিল্পমানসের প্রধান অন্তরায়।

১২.০

মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)[৪] প্রথম সৃজনশীল কল্পনার মাধ্যমে বাস্তব জগতের সত্যকে সাহিত্যের সত্যে পরিণত করলেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, মানবতাবাদ, যুক্তিবাদ, মননশীল জীবনজিজ্ঞাসা, নাগরিক শিল্পবোধের আলোকে বাংলা কবিতাকে প্রথম যথার্থ আধুনিক করে তুললেন। তাঁর কবিচেতনা সুদূর প্রসারী, ঐতিহ্যমুখী। তাঁর ভাবনায় এল যুগযন্ত্রণার ছাপ। পৌরাণিক বিষয়কে নবজাগ্রত আধুনিক যুগপটে স্থাপন করলেন মধুকবি। পাশ্চাত্য জীবনদর্শন ও শিল্পবোধে মধুসূদনের চেতনা ঋদ্ধ। তাঁর লেখনীতেই ক্লাসিক ও রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে বাংলা কাব্যধারা ঐশ্বর্যের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হল। মধুকবিতে একই সঙ্গে বস্তুনিষ্ঠ ও আত্মনিষ্ঠ ভাবের প্রকাশ দেখা গেল। মহাকাব্য মেঘনাদবধ ও আখ্যানকাব্য—বীরাঙ্গনা, ব্রজাঙ্গনা—বস্তুতন্ময় ভাবের স্ফুরণ, আর সনেট ও গীতিকবিতায়— 'বঙ্গভূমির প্রতি' ও 'আত্মবিলাপ'—আত্মতন্ময় ভাবের প্রকাশ। নবজাগ্রত জীবনবোধের সার্থক বাহক মধুকবি।

১২.১

বাংলা কবিতার শিল্পাঙ্গিকের আধুনিক রূপকার মধুসূদন দত্ত। তিনিই বাংলা ভাষায় সাহিত্যিক মহাকাব্যের স্রষ্টা, পত্রকাব্যের ধারা তাঁর সৃষ্টি থেকেই উৎসারিত, সনেটের শরীর ও সত্তার শৈল্পিকরূপের প্রতিষ্ঠা তাঁর হাতেই, ওডের চারিত্রিক ধর্ম তাঁর দান, গীতিকবিতার উৎসমুখ তিনিই খুলে দিলেন। কবিতার ভাবের সঙ্গে আঙ্গিকের শৈল্পিক সংযোগকে তিনিই প্রথম বাংলা ভাষায় প্রতিষ্ঠা দিলেন। তিনি পয়ারের বিবর্তনের মাধ্যমে বাংলা কবিতার ভাবগতি ও উৎকর্ষ সাধন করলেন। পয়ারের মধ্যযুগীয় রীতিতে অর্থযতি ও ছন্দোযতি একত্রে পড়ত তিনি প্রথম ছন্দযতি ও অর্থযতিকে আলাদা-আলাদাভাবে স্থাপন করলেন। ফলে বাক্যে ভাবের প্রবাহমানতা এল, গতি এল, এল বৈচিত্র্য। মধ্যযুগীয় ত্রিপদী ছন্দের নবপরীক্ষায় সার্থকতা দেখালেন মধুসূদন। তিনি অন্ত্যমিলের বাঁধা ছককে ভেঙ্গে দিলেন। প্রচলিত একঘেয়ে সরলব্যঞ্জনের পরিবর্তে অপ্রচলিত কিন্তু শ্রুতিসুখকর ধ্বনিঝঙ্কারযুক্ত যুক্তব্যঞ্জনের প্রয়োগে কবিতায় গাম্ভীর্য ও ওজস্বীভাব সঞ্চার করলেন। পয়ার ছন্দ হয়ে উঠল মহাকাব্যিক ভাব ও ঐশ্বর্যের ধারক ও বাহক। সংস্কৃত ভাষার বিপুল সম্পদ সম্ভারে বাংলা কবিতার জগৎকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন মধুসূদন দত্ত। ফলে বাংলা ভাষায় এসেছে ওজস্বিতা, প্রণময়তা, অনাস্বাদিত রসাবেদন।

১৩.০

মধুকবির সমকালে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩)[৫] মহাকাব্যের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তবে তার জন্য যে ক্লাসিক ও রোমান্টিক শিল্পদৃষ্টির প্রয়োজন তা হেমচন্দ্রের

ছিল না মধুকবির মত। আখ্যানের পরিপাটি রূপটি তিনি সুচারুরূপে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু আত্মার ভাবৈশ্বর্য—মহাকাব্যিক ঔদার্য, ঔজস্বিতা, কল্পনা, জীবনের ব্যাপ্তি ও গভীরতা তাঁর ছিল। ফলে মধুসূদনের অনুকরণে যে শিল্পপ্রতিভার দরকার ছিল, তা হেমচন্দ্রে না-থাকার ফলে তিনি মধুকবিতেই হারিয়ে গেলেন। নবীনচন্দ্র (১৮৪৭-১৯০৯)[৬] বাংলাকাব্যে রোমান্টিক চেতনার প্রসারক। তাঁর ক্লাসিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব আছে সত্য কিন্তু বাংলা কাব্যে স্বাদেশিকতা ও ঐতিহ্যের স্বীকৃতি তাঁর হাতে। বাংলাকাব্যের জগতে যথার্থ আধুনিক আখ্যানকাব্যের সূচনা করেন তিনি। বিষয়বস্তুতে আনেন বৈচিত্র্য। রঙ্গলালের (১৮২৬-১৮৮৭)[৭] কবিতায় বস্তুনিষ্ঠ ভাবই প্রকট। ক্লাসিক ও রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ের অভাব তাঁদের কবিচেতনা মধুসূদনের দীপ্তিতেই ম্লান হয়ে গেছে। এই আখ্যানকাব্য ও মহাকাব্যের কবিদের মাধ্যমে আধুনিকতার মূল বৈশিষ্ট্য স্বাজাত্যবোধ, ঐতিহ্যপ্রীতি, ব্যক্তিস্বতন্ত্রতা, যুগচেতনা, নাগরিক বৈদগ্ধতা, উদার বাস্তববাদী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে জগৎ ও জীবনকে বিচার-বিশ্লেষণের নির্মোহ মনোভঙ্গি বাংলা কাব্যে প্রথম প্রকাশিত।

১৪.০

মধুসূদনের ''আত্মবিলাপ'' ও ''বঙ্গভূমির প্রতি''-তে যে আত্মগত ভাবতন্ময়তার অঙ্কুর, তার প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটে বিহারীলাল চক্রবর্তীর (১৮৩৫-১৮৯৪)[৮] কবিচেতনায়। তিনি বস্তুনিষ্ঠ ভাবনার পরিবর্তে আত্মতন্ময় জীবনবোধকে কবিতায় তুলে ধরলেন। তাঁর চেতনা অন্তর্মুখী। তাঁর কবিতায় দেখা গেল সমাজ বাস্তবতার পরিবর্তে অন্যতর বাস্তবের প্রকাশ—তিনি আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে, কল্পনার সৃজনীশক্তিতে বাস্তব জগৎকে নবরূপে উপস্থাপন করলেন। মধুসূদনের মতো ধর্মের শাসন, সমাজের বাঁধনের কাছে মাথা নত না-করে নিজের মনের কথা নিজের মনের মতো করে বলে গেলেন। তাঁর কবিতায় প্রথম পেলাম আত্মতন্ময় মনের কল্পনাময় প্রকাশ। তিনিই প্রথম বিষয়হীন বিষয় নিয়ে কবিতা রচনা করলেন।

১৫.০

গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৫৫-১৯১৮)[৯] প্রথম যৌবনের রক্তিম বাসনামদির জীবনের সোচ্চার প্রকাশ ঘটিয়েছে কবিতায়। প্রেমকে তিনিই প্রথম জীবনবিবক্ত স্বর্গের থেকে নামিয়ে মর্ত্যের ভোগাসক্তির দৃষ্টিতে দেখেছেন। নারী শুধু অলীক কল্পনার সামগ্রী নয়, রক্তমাংসে তাকে জীবনের সঙ্গে এক করে দেখেছেন।—

''আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ!
আমি ও নারীর রূপে,
আমি ও মাংসের স্তূপে,
কামনার কমনীয় কেলি-কালীদহ—
ও কর্দমে—এই পঙ্কে,

অই ক্লেদে—ও কলঙ্কে,
কালীয় নাগের মত সুখী অহর!
আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ!"
(আমার ভালবাসা : কস্তুরী)

অবদমিত কামনা-বাসনার প্রকাশ গোবিন্দচন্দ্র দাসের কবিতা। লিবিডো সদা সক্রিয় তাঁর চেতনায়। কিন্তু ড. সুকুমার সেন বলেছেন—"স্পষ্ট যৌন-আবেগমূলক রোচক সাহিত্যের গুরু হইলেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৮৮২-১৯৬৪)।"[১০]

১৬.০

বাংলা কাব্যধারার মূলকাণ্ডারী রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১—১৯৪১)[১১] তিনি সূক্ষ্ম মরমীয়া উপলব্ধির কবি। ঔপনিষদিক বোধ, শাশ্বত জীবনান্বেষা, সত্যের সৌন্দর্যময় মাঙ্গলিক প্রকাশ তাঁর কবিতাকে অনন্যসাধারণ করে তুলেছে। তিনি কবিতার বিষয়বস্তুর সীমাকে দেশকালের ঊর্ধ্বে নিয়ে গেলেন। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ঐতিহ্য, ধর্ম-দর্শন, মানুষ-সভ্যতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সংস্কৃতি, ঈশ্বর-প্রকৃতি সবই তাঁর কবিচেতনায় ধরা পড়ল। তাঁর চেতনা অন্তর্মুখী, বিবর্তনধর্মী 'অধিমানসে'র স্পন্দনে সমৃদ্ধ। মননশীলতার সঙ্গে বোধ-বোধি, অভিজ্ঞতার সঙ্গে প্রজ্ঞা, জ্ঞানের সঙ্গে স্বজ্ঞা, অনুভূতির সঙ্গে প্রতীতি, কল্পনার সঙ্গে চিত্রকল্প, ভাবের সঙ্গে আঙ্গিক, অলঙ্করণের সঙ্গে ছন্দোচাতুর্য তাঁর কবিতায় মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। বিষয় ভাবনায় এসেছে বৈচিত্র্য—মানবহৃদয়ের সমস্ত ভাব তাঁর চেতনায় মূর্ত হয়েছে। বিষয়হীন বিষয়কে রবীন্দ্রনাথ আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে কাব্য জগতে উপস্থাপতি করেছেন। বাস্তব সত্যের থেকে কল্পনার সত্যই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে তাঁর কাব্যে।

১৬.১

মধুসূদনের পরে রবীন্দ্রনাথ নতুন কাব্যভাষা নির্মাণ করেন। তিনি কাব্য ভাষার শৈলীনির্মাণ করলেন শ্রুতিমধুর, ধ্বনি ঝঙ্কারযুক্ত, লাবণ্যমণ্ডিত, সুকোমল শব্দের প্রয়োগে। রবীন্দ্রনাথ প্রবাহমান পয়ারের অন্ত্যমিলহীনতাকে ত্যাগ করে তাতে মিল যোজনা করলেন। তিনি শ্বাসাঘাতপ্রাধান ছন্দের শরীরে ধ্বনিঝঙ্কারের সঙ্গে নান্দনিক দ্যুতি দান করে তাকে কমনীয় ও রমনীয় করে তুললেন। ধ্বনিপ্রধান ছন্দের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তানপ্রধানের সুর ও লয় এবং শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দের গতি ও ধ্বনিঝঙ্কার সঞ্চারিত করেছেন। তানপ্রধান ছন্দ ধ্বনিপ্রধান ও শ্বাসাঘাতের প্রাণধর্মে নবরূপ লাভ করেছে তাঁর হাতে। 'বলাকা'তে রবীন্দ্রনাথ মুক্তকের মাধ্যমে নতুন ছন্দকল্প সৃষ্টি করলেন স্তবকের বিন্যাসে নানা বৈচিত্র সৃষ্টি করলেন, গীতিকবিতার আকার ও গঠনে নানা অভিনবত্ব আনেন। তিনি মুক্তক, প্রবাহমান সমিল ও অমিল প্রবাহমান পয়ারের নির্মাতা। গদ্যছন্দের প্রতিষ্ঠাও রবীন্দ্রনাথের হাতে। দেশি ও বিদেশি নানা ছন্দরূপ ও স্তবকের রূপকল্পকে বাংলা কবিতায় আমদানি করেন। রবীন্দ্রনাথ জাপানী হাইকু, তাঙ্কা, চোকা, সেদোকা, ইমায়ো ইত্যাদি ছন্দে কবিতার রাজ্যে বৈচিত্র্য

সাধন করলেন। নানা সংস্কৃত ছন্দকে বাংলা কাব্যের ভাবপ্রবাহের স্বাভাবিক শিল্পমাধ্যমে পরিণত করলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই ভাবে ভাষায় ছন্দে অলঙ্কারে বাংলাকাব্যের প্রাণলক্ষ্মীর শ্রী, হ্রী ও ধীর সার্থক বাণীরূপ দান করলেন।

১৭.০

রবীন্দ্রনাথের সমকালে বাংলা কবিতার রাজ্যে এসেছেন যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, নজরুল ইসলাম প্রমুখ। তাঁরাই প্রথম রবীন্দ্রকাব্যবলয়ের পরিধি থেকে বাংলা কাব্যের প্রবাহকে মুক্ত করে নতুন খাতে প্রবাহিত করলেন। তাঁদের হাতে আধুনিক বাংলা কবিতায় ভাবে ভাষায় আঙ্গিকে যেমন নতুনত্ব এল, তেমনি জীবনদর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গিতে অভিনবত্বে এল।

১৭.১

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৮-১৯৫৪)[১২] বাংলা কবিতার বিবর্তনের ধারাকে নতুন খাতে প্রবাহিত করেছেন। রবীন্দ্রবলয়ে আত্মপ্রকাশ হলেও তিনি রবীন্দ্রনাথের মোহজাল থেকে মুক্ত হয়ে নতুন পথ আবিষ্কার করেছেন। রূঢ় বাস্তব জীবনাভিজ্ঞতা, দুঃখবোধ, জীবনাসক্তিকে তিনি কাব্যে তুলে ধরে অ্যান্টিরোমান্টিক আবহ রচনা করলেন। তিনি কবিতায় আমদানি করলেন নির্মোহ জীবনদৃষ্টি, যুক্তিবাদ, রোমান্টিক ভাবোচ্ছ্বাসহীন প্রকাশভঙ্গি।

১৭.২

নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৭)[১৩] বাংলা কাব্যজগতের উদ্দাম বিদ্রোহী কবি। তিনি তাঁর কাব্যে হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটান। বিপুল আবেগ, সীমাহীন উচ্ছ্বাস, গভীর জীবনাসক্তি, সুতীব্র আত্মদহনের মর্মজ্বালা তাঁর কবিতার ছত্রে ছত্রে প্রতিফলিত। অসংযমী আবেগের দুর্বার প্রবাহে সমাজের প্রচলিত সমস্ত প্রাচীন অন্ধবিশ্বাস, সংস্কার-কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামি, সামাজিক ভেদাভেদের সীমারেখাকে তিনি চূর্ণ করে দিতে চেয়েছেন। অসহায় মানুষের প্রতিকারহীন শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁর অগ্নিবীণা সোচ্চারিত হয়েছে। তিনি কবিতাকে সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের হাতিয়ারে পরিণত করলেন। তাঁর হাতে আত্মজাগরণের পাশাপাশি সমাজসত্তার জাগরণের উপায় হয়ে উঠল কবিতা। সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কাব্যিক রূপায়ণ ঘটেছে তাঁর কবিতায়।

১৭.২.১

কবিতার শিল্পরূপও নজরুলের হাতে পরিবর্তিত হয়েছে। আর্বি ছন্দের প্রতি নজরুল ইসলামের বেশ আগ্রহ ও আকর্ষণ ছিল। তিনি এই বিদেশি ছন্দোরীতি বিচিত্র সম্ভাবনায় বাংলা কবিতার ভাবপ্রবাহকে স্পন্দিত করেছেন। বাংলা ছন্দের সাম্রাজ্য সম্প্রসারিত হয়েছে তাঁর হাতে। তাঁর আর্বি ছন্দের আগ্রহের কারণ নিজেই বলেছেন—"আরবী ছন্দ যেমন দুরূহ, তেমনি তড়িৎ চঞ্চল। প্রতিটি ছন্দের গতি বিভিন্ন রকমের, কেমন যেন চমকে ওঠা

ভাব।—অনেক জায়গায় তাল এক, কিন্তু মাত্রা আর, অনুমাত্রার বিচিত্র সমাবেশের জন্য তার এক আশ্চর্য রকমের ধ্বনি চপলতা ফুটে ওঠে।" তাঁর কবিতায় আমরা পরিচিত হলাম—হজয্, মন্ সরহ্, মুতাদরিক, সরীত্র, মোতাকাবির ইত্যাদি ছন্দের সঙ্গে। ফলে বাংলা কাব্যলক্ষ্মীর ভাণ্ডার হয়েছে সমৃদ্ধ। নজরুল বিদ্রোহের সুতীব্র জ্বালা, আবেগের অসহিষ্ণু প্রবাহকে কবিতার মধ্যে সঞ্চারিত করতেই বিদেশি ছন্দের পাশাপাশি আর্বি-ফার্সি শব্দের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। ফলে বাংলা কাব্যশৈলীতে নতুনত্ব সৃষ্টি হয়েছে। তিনি কাব্যে ভাষা নিয়ে উন্নাসিকতাকে মুছে দিলেন। তিনি বিদেশি ছন্দের পাশাপাশি সংস্কৃত ছন্দেও কবিতা রচনা করেছেন। যেমন তিনি মোতাকাবির ছন্দে লিখলেন 'দোদুল দুল', সার্দুল বিক্রীড়িত ছন্দে নজরুলের 'পুবের হাওয়া', তোটকে 'জাগৃহি', সিংহ বিক্রীড়ে 'পুবের হাওয়া' রচিত। তিনি স্তবকের বিন্যাসে নানা বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন—তাঁর হাতে পূর্ণ অপূর্ণ পর্বের লীলায় কবিতা অভিনব ব্যঞ্জনা লাভ করেছে।

১৭.৩

মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২)[১৪] সচেতন জীবনদর্শন নির্মাণ করে সৌন্দর্যতৃষ্ণা ও আধ্যাত্মিক অন্বেষণকে ক্লাসিক গাম্ভীর্যে রোমান্টিক অনুভবে প্রথম কবিতায় তুলে ধরেন। তাঁর 'অকুণ্ঠ পৌরুষ'-এর মূলে আছে তান্ত্রিক দেহাত্মবাদ, ভোগবাদ ও অগাধ প্রেম। তাঁর কবিতা ভাস্কর্যধর্মী—পরিশীলিত, পরিমার্জিত পরিচ্ছন্ন গঠন ও ভাবের বিন্যাস। গঠনে ভাবে ভাষায় এক 'অখণ্ড সুডোল উদাত্ত ধ্বনিময় কাব্যসঙ্গীত' হল কবি-সমালোচক মোহিতলালের কবিতা।

১৭.৪

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২)[১৫] রবীন্দ্রকাব্যবলয়ের অপর ব্যতিক্রমী কবিপ্রতিভা। গভীরতর জীবনসত্যের প্রকাশে ব্যর্থ হলেও তিনি প্রকৃতির সৌন্দর্যময় রোমান্টিক রূপকে সুচারুরূপে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। বাংলা কবিতার ভাব ভাষা আঙ্গিক তাঁর হাতে নবরূপ লাভ করেছে। তিনি কবিতার আঙ্গিকে সফল হলেও ভাবের ঐশ্বর্যে শিল্পরূপকে যথার্থ উপস্থাপিত করতে পারেন নি।

১৭.৪.১

সত্যেন্দ্রনাথ বাংলা কাব্যের কারুশিল্পী। কবিতার আঙ্গিক ও ছন্দ নিয়ে নানা পরীক্ষানিরীক্ষা করে তিনি বাংলা কাব্যের ধারাকে সমৃদ্ধ করেছেন এবং ভাব প্রকাশের নতুন কৌশল আবিষ্কার করেছেন। প্রচলিত বাংলা ছন্দের পাশাপাশি সংস্কৃত, বিদেশি, হিন্দী, মারাঠী ও গুজরাটি ভাষার ছন্দেও কবিতা রচনা করেছেন। যেমন তিনি অঁজনী ছন্দে লিখলেন 'খোকা' Bumos বা বেদীভূমক ছন্দে লিখলেন 'রাজর্ষি রামমোহন' এবং 'দিগ্বিজয়ী'। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত নজরুলের মতো আর্ব-ফার্সি শব্দে কাব্যের শরীরকে সুচারু করেছেন। তিনি কিন্তু সংস্কৃতের সংস্কারকে বর্জন করতে পারলেন না। অ্যান্টিরোমান্টিক দৃষ্টি নিয়ে জগৎ ও জীবনকে বিচার ও বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ভাষাতেও বাস্তবতাকে সঞ্চারিত করলেন।

১৮.০

রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিদের মাধ্যমে চেতনা হয়ে উঠল সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর। তাঁদের হাতে কবিতা হয়ে উঠল মননপ্রধান, বুদ্ধিপ্রধান, অভিজ্ঞতাসম্মনিত, বিশ্ববীক্ষাময় সমৃদ্ধ। বাংলা কবিতার ভৌগোলিক সীমা সম্প্রসারিত হল, চেতনার ঊর্ধ্বায়ন ঘটল। শিল্পের বিভিন্ন শাখার সঙ্গে কবিতার আত্মিক যোগ ঘটল।

১৮.১

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)[১৬] বোধের আলোকে জগৎ ও জীবনকে দেখেছেন ও কাব্যে তুলে ধরেছেন। ফলে তাঁর কবিতা আমাদের সাধারণ চেতনায় অতি কঠিন হয়ে পড়েছে। জীবনানন্দ দাশের হাতে কবিতার ভাষা নবরূপ লাভ করেছে। তিনি সহজ সরল গ্রাম্যশব্দের পাশাপাশি সংস্কৃত বিদেশি শব্দের মিশেলে এক অদ্ভুত কাব্যশৈলী সৃজন করলেন। বাক্যের স্বাভাবিক পদক্রম প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হয়েছে তাঁর শৈলীতে। তাঁর কাবশৈলী বা প্রকাশভঙ্গি গেছে পাল্টে। কবির মনোভূমিতে বিষয়ের আধিপাত্য ও শিল্পাঙ্গিকের স্বীকৃতি জীবনানন্দের ভাষার—"আমার কবিতাকে বা এ-কাব্যের কবিকে নির্জন বা নির্জনতম ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে; কেউ বলেছেন, এ কবিতা প্রধানত প্রকৃতির বা প্রধানত ইতিহাস ও সমাজচেতনার; অন্য মতে নিশ্চতেনার; কারও মীমাংসায় এ কাব্য একান্তই প্রতীকী; সম্পূর্ণ অবচেতনার; সুররিয়ালিস্ট। আরও নানারকম আখ্যা চোখে পড়েছে। প্রায় সবই আংশিকভাবে সত্য—কোনো-কোনো কবিতা বা কাব্যের কোনো-কোনো অধ্যায় সম্বন্ধে খাটে; সমগ্র কাব্যের ব্যাখ্যা হিসেবে নয়।"[১৭] তিনি ঐতিহ্যের সঙ্গে লোকায়ত সামজিক অভিজ্ঞতাকে কাব্যের অঙ্গীভূত বিষয় করেছেন। তাঁর বিশ্বাস "কবির পক্ষে সমাজকে বোঝা দরকার, কবিতার অস্থির ভিতর থাকবে ইতিহাসচেতনা ও মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান। কাল বা সময় বৈনাশিক; কিন্তু সে সেই সমস্ত কুয়াশাগুলোকেই কেটে-কেটে চলেছে যা পরিপ্রেক্ষিতের ব্যক্তি বাড়াবার পক্ষে অন্তরায়ের মতো"।[১৮] জীবনানন্দ সেই কালসচেতন, ইতিহাসসচেতন, সামাজিক অভিজ্ঞতার কবি।

১৮.১.১

বাংলা কবিতার আঙ্গিক ও শিল্পরূপের পরিবর্তন দেখা গেল জীবনানন্দের কবিতাতে। সনেটের সংহত রূপের পারিপাট্য অনেকটা শিথিল হল। 'রূপসী বাংলা'য় সমন্বিত সনেট বা Sonnet sequence রচনা করলেন। তিনি নানা আঙ্গিকে কবিতার স্তবক রচনা করলেন। কবিতার আকার যেমন হল ক্ষুদ্র, তেমনি দীর্ঘায়িত। চোদ্দ পঙ্‌ক্তি পয়ারকে ষোল পঙ্‌ক্তির মহাপয়ারে পরিবর্তিত করলেন, জীবনানন্দ দাশ মহাপয়ারকে আরো দীর্ঘায়িত করে চরণে মাত্রাকে বিয়াল্লিশ মাত্রা পর্যন্ত সম্প্রসারিত করলেন। 'উপমাই কবিত্ব' এই সত্য যথার্থ জীবনানন্দ দাশের কবিতা। উপমার অপার ঐশ্বর্যকে বিপুল শিল্পসাফল্য তাঁর হাতে উপস্থাপিত। বিরাম-চিহ্নকে তিনি ভাষারূপ দিলেন।

১৮.২

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০)[১৯] ঔপনিষদিক বোধের আলোকে নাগরিক জীবনের রূপান্তরের স্বরূপকে আলোকিত করতে চেয়েছেন। প্রাচীন অভিধান-ক্লিষ্ট শব্দের বুকে যে অর্থের সুষুমা নিহিত আছে তাকেই আবিষ্কার করতে চেয়েছেন তিনি। কাব্যিক আবেদনকে শব্দের সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়েছেন। ক্লাসিক আঙ্গিকের বয়নে তিনি কবিতার নিটোল কায়ারূপ নির্মাণ করেছেন। দার্শনিক উপলব্ধির গভীরতা তাঁর কবিতার অন্তর্লোককে আলোকিত করেছে। যন্ত্রণা বিক্ষুব্ধকালের পটে অস্তি-নাস্তির দ্বন্দ্বে তাঁর কবিসত্তা ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। সেই বেদনাহত মানবসত্তার শুশ্রূষার সামগান সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা। ঔপনিষদিক বোধির আলোকে তাঁর কবিসত্তার স্বীকৃতি। তাঁর চেতনা অন্তর্মুখী, দার্শনিক সত্যের দ্যুতিতে ভাস্বর।

১৮.২.১

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যে দেখা গেল প্রাচীন অপ্রচলিত শব্দের প্রয়োগ সাফল্য। এতে কাব্যে পাণ্ডিত্য প্রকাশের পাশাপাশি নতুন ভাষাশৈলী নির্মাণ করলেন বটে তবে পাঠকের কাছে শব্দের প্রাচীর অতিক্রম কঠিন হয়ে উঠল। মধুসূদনও অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ বহুল পরিমাণে প্রয়োগ করেছিলেন বটে তবে তাঁর ভাবৈশ্বর্যের সঙ্গে ভাষা ওতোপ্রোতভাবে সংপৃক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের শব্দ অনেকটা কৃত্রিম; ভাবের সঙ্গে ভাষার অদ্বয় বন্ধন রচিত হয় নি।

১৮.৩

আবিশ্বের অভিজ্ঞতার আলোকে জগৎ ও জীবনের রূপান্তরকে ধরতে চেয়েছেন বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২)[২০] বিষ্ণু দে ভাষার কোন বাধা-ধরা নিয়মকে স্বীকার করলেন না বটে। কিন্তু তিনি বিশ্ববীক্ষার আলোকে জগৎ ও জীবনের বিন্যাসকে রূপদান করতে গিয়ে বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাস ভূগোল মন্থন করে কবিতার শরীরকে সুসজ্জিত করলেন। এই প্রক্রিয়ায় তিনিও স্বতন্ত্র কাব্যভাষা তৈরি করেছেন ঠিকই কিন্তু পাঠকের স্মৃতিতে বেশি স্থান দখল করতে পারে নি। সঙ্গীত, চলচ্চিত্র ও অন্যান্য শিল্পমাধ্যম তাঁর কবিতায় কাব্যিক বোধ প্রকাশের প্রধান উপকরণে পরিণত হল। ফলে তাঁর হাতে কবিতার শৈলী এক মিশ্র শিল্পমাধ্যমে রূপায়িত হল।

১৮.৪

প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯)[২১] প্রথম সচেতন নাগরিক জীবনসত্যের প্রকাশ ঘটিয়েছেন বাংলা কবিতায়। নাগরিক জীবনের অন্তঃসারশূন্যতা, মানবিক অবক্ষয় ও দ্বন্দ্বকে সহজ সরল মিতভাষে স্পষ্টরূপে চিত্রিত করেছেন তিনি। ভৌগোলিক পরিধিকে তিনি সম্প্রসারিত করেছেন বাংলা কাব্যজগতে। তিনি ফেরারী ফৌজের প্রথম ভ্রাম্যামান নাবিকের চিত্রকল্পে বিশ্বসত্তায় আত্মাবিষ্কার করেছেন।

১৮.৫

অমিয় চক্রবর্তীর (১৯০১-১৯৮৬)[২২] কবিতায় মিশেল ঘটেছে অনুভূতি প্রবণতা, ঔপনিষদিক অনুভব, জীবনের সূক্ষ্ম অস্তিত্বের আবিষ্কার। যে মৌন ধ্যানস্তব্ধতা অমিয় চক্রবর্তীর কবিসত্তায় লীন, তা যেন প্রতিভাত হয়ে উঠল তাঁর ভাষায় ও কবিতার বিষয়ে। ঔপনিষদিক স্বজ্ঞার সঙ্গে আধুনিক জীবনের মননলব্ধ অভিজ্ঞতা তাঁর কবিতার বিষয়কে সাধারণ থেকে অসাধারণ করে তুলেছে। প্রতীকধর্ম তাঁর কবিতার প্রাণ। তিনি ভাষার ব্যাকরণকে উপেক্ষা করে টুকরো টুকরো আপাত অসংলগ্ন বর্ণিল চিত্রের মাধ্যমে এক নতুন কাব্যশৈলী তৈরি করলেন। আঙ্গিকের অসংখ্য কৌশল তাঁর কবিতায় বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পর তিনি শৈল্পিক দৃষ্টি কবিতার গঠন নিয়ে সার্থক পরীক্ষা করেন।

১৮.৬

রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক বাংলা কাব্যধারার অগ্রদূত— প্রচারক, উদ্বোধক ও বাহক বুদ্ধদেব বসু (১৯০৭-১৯৭৪)[২৩] বাংলা সনেটের গঠন ও রূপকল্পে নানা বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। আধুনিক কবিতার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণপুরুষ বুদ্ধদেব বসু বাংলা কবিতায় রোমান্টিক কল্পনা ও ভাবসর্বস্ব, আবেগময় শব্দকে সম্পূর্ণ বর্জন করতে আহ্বান জানান। মুখের ভাষার সঙ্গে কবিতার ভাষার ব্যবধানকে মুছে দিতে চেয়েছেন। পাশাপাশি তিনি রবীন্দ্রকাব্যভাষার মোহজাল থেকে মুক্ত হয়ে নতুন পথ আবিষ্কারের প্রেরণা দিয়েছেন। তিনি এইভাবেই কাব্য সাধনা করে সাফল্য লাভ করেন।

১৮.৭

আধুনিক নাগরিক জীবনচেতনা ও বিশ্বযুদ্ধ বিধ্বস্ত মানবাত্মার আত্মিক যন্ত্রণা প্রকাশের পথ পেল সমর সেনের (১৯১৬-১৯৮৭)[২৪] কাব্যশৈলীতে।

১৮.৮

রাজনৈতিক মতাদর্শ ও ভাষাভঙ্গিকে সুভাষ মুখোপাধ্যায়[২৫] কবিতার শরীরে স্থাপন করে নতুন বাগভঙ্গি নির্মাণ করলেন। কবিতার বিষয় ও প্রকাশভঙ্গিতে বাস্তবতা, প্রত্যক্ষতা ও প্রতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সঞ্চারিত হল। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর[২৬] কাব্যশৈলীতে স্থান পেল সুভাষের এই আদর্শ তবে অন্যভাবে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ ততোটা সোচ্চারে ধ্বনিত হল না। সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-১৯৪৭)[২৭] বিদেশী ছন্দের আদলে অন্নদাশঙ্কর রায়[২৮] গড়লেন লিমেরিক এবং ক্লেরিহিউ।

১৯.০

প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) কাব্যের বিশেষ আঙ্গিক নির্মাণ করলেন। ভাবের সঙ্গে আঙ্গিকের শৈল্পিক সংযোগ স্থাপন করলেন। কবিতার ভাস্কর্যপ্রতিম রূপকল্প নির্মাণ করেন। ভাবে ভাষায় কোন প্রকার শিথিলতাকে তিনি স্থান দেন নি। সহজ সরল ভাবের যুক্তিপূর্ণ বিন্যাসে কাব্য ভরপুর।

২০.০

কাব্যাঙ্গিকের সামগ্রিক আলোচনার আগে ছন্দের বিবর্তন ও রূপান্তরের বৈচিত্র্যপূর্ণ ইতিহাসকে আলোকিত করতে পারি। কবিতায় ছন্দ কবির সচেতন শিল্পমানসের প্রকাশ। কবিতার ছন্দের চরিত্র একান্তভাবে আত্মিক উপলব্ধি ও বোধির স্বতঃস্ফূর্ত অনুপ্রেরণজাত। ফলে এর জাতি নির্ধারিত হয় কবিতার সৃষ্টি মুহূর্তেই। এ-সম্পর্কে জীবনানন্দ দাশ বলেছেন—"কোন ছন্দে কবিতাটি রচিত হবে মুহূর্তের ভিতরেই নির্ণীত হয়ে যায় অনেক সময়; কারণ যে কোনো আবেগ যে কোনো ছন্দে রূপ পরিগ্রহ করতে পারে না, কবি প্রেরণার তারতম্য অনুসারে ছন্দের জাতি নির্ণিত হয়।"[২৯]

আধুনিক কালে বাংলা ছন্দ নানা রূপে পরিচিত হল—১। পয়ার বা অক্ষরবৃত্ত বা তানপ্রধান, ২। ধ্বনিপ্রধান বা মাত্রাবৃত্ত, ৩। শ্বাসাঘাতপ্রধান বা স্বরবৃত্ত বা লৌকিক ছন্দ বা ছড়ার ছন্দ, ৪। গদ্যছন্দ, ৫। মুক্তক, ৬। অন্যান্য দেশি-বিদেশি বাংলা কাব্যে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

২০.১

ছন্দের ধর্ম গেল পাল্টে তানপ্রধান ছন্দে সঞ্চারিত হল ধ্বনিপ্রধান বা শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দের ধ্বনিঝঙ্কার ও গতি; অন্যদিকে ধ্বনিপ্রধান ছন্দে স্পন্দিত হল শ্বাসাঘাতের গতি ও ধ্বনিঝঙ্কার বা তানপ্রাধানের বিলম্বিত তান ও সুর। শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দে একই সঙ্গে অনুরণিত হল ধ্বনিপ্রধানের স্পন্দন ও দোলা এবং তানপ্রধানের সুরেলা আবেশ। কখনো আবার একটি কবিতাতে দুটি আলাদা আলাদা ছন্দের প্রবেশ ঘটিয়েছেন কবিগণ। বিদ্যাসাগর বাংলাগদ্যে যে ছন্দস্পন্দন আবিষ্কার করেছিলেন আধুনিক কবিগণ তার সুষ্ঠু প্রয়োগে বাংলা কবিতার প্রকাশ মাধ্যমকে পরিবর্তিত করলেন। আধুনিক কালে বাংলা প্রচলিত ছন্দের মধ্যে সংস্কৃত ও বিদেশি ছন্দের গতি ও প্রাণধর্মকে সচেতনভাবে যুক্ত করলেন কবিগণ।

২০.২

একই স্তবকে সংমিশ্রণ দেখা গেল দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চৌপদীর আধুনিক কালের আগে যা অকল্পনীয় ছিল—

ধৈর্য ধর, ধৈর্য ধর, বাঁধ বাঁধ বুক,
শিরোপরে শতবজ্র গর্জিবে গর্জুক।
রহ হিমাদ্রির মত,
হইও না অবনত,
পতঙ্গের পদাঘাতে তৃণ অধোমুখ।
হলে হও খণ্ড খণ্ড,
সৃষ্টি করি লণ্ডভণ্ড
ব্রহ্মাণ্ড কাঁপুক।
গম্ভীর গৌরব ভরা,

মহাদম্ভে ভেঙ্গে পড়া
কি আনন্দ কি প্রচণ্ড সুখ।"
(কর্তব্য : গোবিন্দচন্দ্র দাস)

২০.৩

আধুনিক কবিগণ একই চরণে নানা মাত্রার পর্ব স্থাপনা করলেন, আবার পর্বের একটি মাত্রা বিলোপের মাধ্যমে নতুনত্ব আনলেন। কখনো আবার অতিপর্ব সৃষ্টি করে বা একটি পর্বকে বা চরণকে কয়েকটি লাইনে বিভাজিত করে অভিনবত্ব সৃষ্টি করলেন।

বাবুদের তাল-পুকুরে
হাবুদের ডাল-কুকুরে
সে কি বাস্ করলে তাড়া,
বলি থাম্ একটু দাঁড়া!

২০.৪

পয়ার ছন্দের আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রভাবের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন জীবনানন্দ দাশ। তাঁর ভাষায় : "পয়ার ছন্দ যে বাংলা কবিতার প্রাণ ও আত্মা (আজ পর্যন্ত), অন্য কোনো ছন্দ যে পয়ারের এই শীর্ষদেশী মাহাত্ম্য ও গহনতার স্থান নিতে পারে না, রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ প্রধান কবিদের রচনায় তা স্বতঃপ্রমাণিত হয়ে রয়েছে।"[৩০] এই পয়ার ছন্দকে নিয়ে আধুনিক কবিগণ নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, নির্মাণ করেছেন নতুন নতুন ছন্দোশৈলী। পয়ারের গর্ভে জন্ম নিল মধুসূদনের হাতে প্রবহমান অমিত্রাক্ষর, রবীন্দ্রনাথের হাতে সমিল প্রবাহমান মহাপয়ার, মুক্তক। গদ্যছন্দের মর্মে পয়ারের স্পন্দন শোনা যায়।

২০.৪.১

বাংলা পয়ার বা তানপ্রধান ছন্দের চরণে মাত্রা ও পর্বের বিন্যাস বৈচিত্র্যকে দেখানো যেতে পারে,

এক।। প্রচলিত তানপ্রধান, ১৪ মাত্রার চরণ, পর্ববিন্যাস ৮+৬

'পয়সা করিনি আমি, পাইনি খেতাব।
পাঠকের মুখ চেয়ে লিখিনি কেতাব।'
(প্রমথ চৌধুরী : ব্যর্থজীবন)

দুই।। মহাপয়ার, ১৮ মাত্রার চরণ, পর্ববিন্যাস ৮+১০

'আমারে ফুটিতে হ'লো বসন্তের অন্তিম নিশ্বাসে,
বিষণ্ণ যখন বিশ্ব নির্মম গ্রীষ্মের পদানত;'
(সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত : চম্পা)

তিন।। মহাপয়ার, ২২ মাত্রার চরণ, পর্ববিন্যাস ৮+৮+৬

'এই সব ত্যক্ত পাখি কয়েক মুহূর্ত শুধু ; আবার করিছে আরোহণ
আঁধার বিশাল ডানা পাম গাছে—পাহাড়ের শিঙে-শিঙে সমুদ্রের পারে;'
(জীবনানন্দ দাশ : শকুন)

চার।। ২৬ মাত্রার চরণ, পর্ববিন্যাস ৮+৮+১০
'এই সব ত্যক্ত পাখি কয়েক মুহূর্ত শুধু ; আবার করিছে আরোহণ
আঁধার বিশাল ডানা পাম গাছে—পাহাড়ের শিঙে-শিঙে সমুদ্রের পারে ;'
(জীবনানন্দ দাশ : শকুন)

পাঁচ।। ৩০ মাত্রার চরণ, পর্ববিন্যাস ৮+৮+৮+৬
''আমাদের জীবনের অনেক অতীত ব্যাপ্ত আজও যেন লেগে আছে বহুতা পাখায়
ঐসব পাখিদের। ঐসব দূর-দূর ধানক্ষেতে, ছাতকুমড়োমাথা ক্লান্ত জামের শাখায়;''
(অঘ্রানের প্রান্তর : বনলতা সেন : জীবনানন্দ দাশ)

ছয়।। ৩৪ মাত্রার চরণ, পর্ববিন্যাস ৮+৮+৮+১০
''পৃথিবীর পথে গিয়ে কাজ নেই, কোনো কৃষকের মতো দরকার নেই দূরে মাঠে গিয়ে আর!'
(অবসরের গান : ধূসর পাণ্ডুলিপি: জীবনানন্দ দাশ)

সাত।। ৪২ মাত্রার চরণ, পর্ববিন্যাস ৮+৮+৮+৮+১০
''অনেক দিনের গন্ধে ভরা ঐ ইঁদুরেরা জানে তাহা জানে তাহা নরম রাতের হাতে ঝরা এই শিশিরে জলে!''

২০.৫
বাংলা কাব্যছন্দের ইতিহাসে প্রথম বৈচিত্র্য আনলেন শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দের প্রয়োগ করে বিজয়গুপ্ত। তাঁর মনসামঙ্গল কাব্যে প্রথম শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। শাক্তপদাবলীতে এই ছন্দের সফল শিল্পিত ব্যবহার করেছেন রামপ্রসাদ সেন ও কমলাকান্ত ভট্টাচার্য। তাঁরা এই ছন্দোরীতির ধ্বনিঝঙ্কার ও গতিধর্মকে আবিষ্কার করে বিষয়ানুগ করে তুললেন। ঈশ্বর গুপ্তের ভাব প্রকাশের মাধ্যম হয়ে উঠল এই শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ। আধুনিক কবিদের হাতে নানা বৈচিত্র্য ও সম্ভাবনায় অভিনব হয়ে উঠল।

২০.৬
গদ্যছন্দ পয়ারের রূপান্তির গদ্যরূপ। কাব্যিক অনুভূত ও রসমাধুর্য নিষ্কাষিত করে সাধু-ভাষার ভঙ্গির মাধ্যমে ধ্বনিস্পন্দকে আবিষ্কার করে আধুনিক কবিগণ এই ছন্দোরূপ নির্মাণ করলেন।

২০.৭
বাংলায় নানা দেশি-বিদেশি ছন্দের আমদানি ঘটে আধুনিক কবিদের সচেতন কবিপ্রতিভাবলে। ফলে বাংলা কবিতার স্পন্দনের নতুনপ্রাণের সারা জেগেছে। উপেন্দ্রবজ্রা অনুষ্টভ, শিখিরিণী,

গজগতি, নিশিপাল, রুচির, পঞ্চচামর, লীলাখেলা, স্রগ্ধরা পজ্‌ঝটিকা, তোটক, মন্দাক্রান্তা, বসন্ততিলক, মালিনী, বিদ্যুন্মালা ইত্যাদি সংস্কৃত; চীনা আলগ্‌ পাপড়ি ছন্দ; মদীদ, তবীল, রমল, মোতাকারিব্‌ ইত্যাদি আরবী-ফার্সী ছন্দের আগমন ঘটে। হিন্দী, মারাঠী ও গুজরাটি ভাষার অঁজনী; বেদীভূমক জাপানী হাইকু, তাঙ্কা, চোকা, সেদোকা, ইমায়ো ইত্যাদি ছন্দে কবিতার রাজ্যে বৈচিত্র্য সাধন করেন।

২১.০

বাংলা কবিতায় স্তবক বিন্যাস রীতি মূলত পাশ্চাত্যের কাব্যপ্রকরণ থেকে গৃহীত। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে বাংলা কবিতায় স্তবকের সার্থক প্রয়োগ দেখা যায়। এর আগে কবিতাকে বিভিন্ন স্তবকে বিন্যস্ত হতে দেখা যায় নি। বিশ শতকেই চরণের মাত্রা সমতা বদলে গেল, অসম মাত্রার চরণ সৃষ্টি হল। চরণান্তিক মিলের সঙ্গে পর্বান্তিক মিলও দেখা গেল। একটি চরণ দুটি বা তিনটি চরণে বিভাজিত হল। বিভিন্ন চরণের স্তবকে কবিতার অঙ্গ সজ্জিত হল। স্তবকে চরণের রূপবৈচিত্র্য সৃষ্টি হল—দ্বিপাদিকা (দুটি চরণে, ইংরেজি –cuplet), ত্রিপাদিকা (তিনটি চরণে), চতুষ্ক (চার চরণে, ইংরেজি Rerza Rima, Rercet), পাঞ্চালী (পাঁচটি চরণে), ষটক (ছয় চরণে), সপ্তপদী (সাতটি চরণে), অষ্টক (আট চরণে)। এ-ছাড়াও আছে গাথা (ballad), ভিনানেল (Villanelle), সেস্টিন (Sestina), কৌতুক কণা (limerick), ট্রিয়োলেট (Triolet) ব্যালদ (Ballade), স্পেনসেরীয় স্তবক (কখকখখগখগগ), তেজিরিমা (কখক, খগখ, গঘগ....)। বেণীবদ্ধ মিল (intelace-rhyme), সনেটের মিলবিন্যাস—পত্রার্কীয় মিল—ককখককখখক গঘঙগঘঙ), শেক্সপীয়রীয় মিল (কখককগগগগ ঙচঙচছছ)। এছাড়াও নানা প্রকার মিলের প্রয়োগ দেখা যায় আধুনিক কালে—প্রাচীন ও মধ্যযুগে যা কল্পনা করা যেত না। প্রবাহমান চতুর্দশপদী কবিতা বা sonnet-sequence সৃষ্টি করলেন জীবনানন্দ দাশ রূপসী বাংলাতে। চরণে অতিপর্বের আয়োজন কবিতার শরীরে সুতীব্র আবেগের গতি সঞ্চারিত হল। স্তবকে চরণ সজ্জায় নানা বৈচিত্র দেখা গেল—

২১.১

স্তম্ভাকার ঃ

একমুখীন সংহত ভাবের প্রকাশ মাধ্যমরূপে এই স্তবককে স্বীকৃতি জানালেন আধুনিক কালে কবিগণ। নিটোল কায়াতে কবি একটি ভাস্কর্যপ্রতিম ভাবরূপ যেন নির্মিত হয় এই স্তবকে।

"নিবে গেল দীপাবলী; অকস্মাৎ অস্ফুট গুঞ্জন
স্তব্ধ হল প্রেক্ষাগারে। অপনীত প্রচ্ছদের তলে,
বাদ্যসমবায় হতে, আরম্ভিল নিঃসঙ্গ বাঁশরী
নম্র কণ্ঠে মরমী আহ্বান; জাগিল বিনম্র সুরে
কাম্পিত উত্তর বেহালায় অচিরাৎ। মোর পাশে

সমাসক্ত নাগর-নাগরী সঙ্গে সঙ্গে বিকর্ষিল
ছিন্নগুণ ধনুকের মতো; গাঢ়হাস্য প্রণয়ের
একান্ত প্রলাপ লজ্জা পেল সাধারণ্যে। আচম্বিতে
সচেতন প্রতিবেশিনীর ক্ষৌম কেশে উচ্চকিত
রতিপরিমল, পরদেশী সংগীতের ঐকতান
সমর্থনে যেন, পুনরায় উদ্বুদ্ধ করিল চিত্তে
অতিক্রান্ত উৎসবের বিক্ষুব্ধ ও বিক্ষিপ্ত সম্মোহ।।''

(অর্কেস্ট্রা : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত)

২১.২

পিরামিডাকার ঃ

শুধুমাত্র বৈচিত্র্য সৃষ্টিতেই আধুনিক কবিরা এই ধরণের স্তবক রচনা করেন না, তাঁরা ভাবসত্যের কল্পরূপ শব্দচিত্রে পাঠকের মনে সঞ্চারিত করতে চান কবির নিজস্ব চেতনালোককে।

'বহুভাগ্য সেই
জন্মিয়াছি এমন বিশ্বেই
নির্দোষ যা নয়।
দুঃখ লসা ভয়
ছিন্ন সূত্রে জটিল গ্রন্থিতে
রচনার সামঞ্জস্য পদে পদে রয়েছে খণ্ডিতে।
এই ত্রুটি দেখেছি যখন
শুনিনি কি সেই সঙ্গে বিশ্বব্যাপী গভীর ক্রন্দন
যুগে যুগে উচ্ছ্বসিত থাকে;
দেখিনি কি আর্তচিত্ত উদ্বোধিয়া রাখে
মানুষের ইতিবৃত্ত বেদনার নিত্য আন্দোলনে।'

(বিরোধ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

২১.৩

সোপানস

কবিতার উত্থান-পতনময় সর্পিল গতিময় জটিল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ ভাবকল্পনাকে কাব্যরূপ দিতে বারে বারে একালের কবিদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছে এই সোপনাকার স্তবক বিন্যাস। এই স্তবক বিন্যাসে কবি ভাবের গতিকে ছন্দের সঙ্গে স্তবকের অঙ্গে চিত্ররূপ দান করেন। একটির পরে একটি স্তর ভেদ করে যেন কবিগণ এই রীতিতে ভাবের সেই গহন গভীর দুর্গে পৌঁছে দিতে চান পাঠকে। এর প্রবাহের গতি অবরোহী।

"মেঘে মাঠে শুভক্ষণে ঐক্যধারে
বিদ্যুতে
আগুনে
ঘূর্ণাঝড়ে
সৃজনের অন্ধকারে বৃষ্টি নামে বর্ষাজলধারে।।"
(বৃষ্টি : অমিয় চক্রবর্তী)

২১.৪

ডম্বরু-আকার ঃ এই রীতি কবিদের বেশ জনপ্রিয় ভাবের দোলাকে তুলে ধরার সহায়ক শিল্পকৌশল।

'নতুন করিয়া বসা আর ভাঙা পুরনো হাটের মেলা;
দিবসরাত্রি নূতন যাত্রী, নিত্যনাটের খেলা!
খোলা আছে হাট মুক্ত বাতাসে,
বাধা নেই ওগো, যে যায় যে আসে,
কেহ কাঁদে, কেহ গাঁটে কড়া বাঁধে রে ফিরবার বেলা।
উদার আকাশে মুক্ত বাসাতে চিরকাল একই খেলা।'
(হাট—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত)

২১.৫

তরঙ্গায়িত স্তবকঃ

কবিতা ভাবের ভাষারূপ। কবিচিত্তে যে ভাবের দোলা, গতির খেলা তাকেই সচেতন ভাবে আধুনিক কবিরা স্তবকের সজ্জাতে ফুটিয়ে তুলতে চান। ফলে কবিতার মর্মলোক উন্মোচিত এই তরঙ্গায়িত স্তবকে।

"তুমি কি কেবলি ছবি শুধু পটে লিখা।
ওই যে সুদূর নীহারিকা
যারা করে আছে ভিড়
আকাশের নীড়,
ওই যারা দিনরাত্রি
আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী
গ্রহ তারা রবি,
তুমি কি তাদের মতো সত্য নও।
হায় ছবি, তুমি শুধু ছবি?"

—প্রতিটি স্তবক নির্মাণে আছে কবির শিল্পমানসের প্রকাশ।

২২.০

লেখতত্ত্ব (Graphology) গড়ে ওঠে লেখকে লিখনশৈলীর স্বরূপ ও বৈচিত্র্য নিয়ে। লেখকের লিখনরীতিতে নিহিত থাকে কবিতার ভাবসত্য, জীবনদর্শন, শিল্পমানস ও মনস্তত্ত্ব। আধুনিক যুগে কবিতার আঙ্গিকের বাহ্য সজ্জাতে কবি বোধকে মুদ্রিত করে দিলেন। কবিতার উপস্থাপন কৌশল মুখ্য হয়ে উঠল একালে। কবিতার আকার আয়তন, স্তবক নির্মাণ, চরণ বিন্যাস বৈচিত্র্য, বিরাম চিহ্নের প্রয়োগ নিপুণতা, মুক্ত অবসর (free space) মধ্যে কবির সচেতনার প্রতিফল দেখা গেল। এখানে আঙ্গিক শুধু ছন্দোরীতির বিশেষ বিন্যাসে সীমাবদ্ধ থাকল না, শিল্পবোধের দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। একালের কবিতা একই সঙ্গে হয়ে উঠল শ্রুতিযোগ্য, আবৃত্তিযোগ্য ও দর্শনযোগ্য। চোখের ভাষায় কবিতার রসকে আস্বাদন করা সম্ভব হল। আবৃত্তি হল কবিতার রসগ্রহণে সহায়ক।

২২.১

বিরাম চিহ্ন কবিতার ভাবের গতিকে, স্পন্দকে, উচ্ছ্বাসকে সংহত ও নিয়ন্ত্রিত করে অর্থের দ্যুতিকে উদ্ভাসিত করে। বিদ্যাসাগর গদ্যে যার সুষ্ঠু শিল্পিত প্রয়োগে নান্দনিক আবেদন সৃষ্টি করেছিলেন, উনিশ শতকের কবিতায় মধুসূদন তার অপার ঐশ্বর্যকে তুলে ধরলেন। তাঁর আগে যতি চিহ্নের কোনো বৈচিত্র্য ছিল না। তখনও তার বিপুল সম্ভাবনার ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয় নি। রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনের সৃষ্ট পথে অগ্রসর হয়েও বিরাম চিহ্নের অর্থময়তায় নবৈশ্বর্যময়তাকে আবিষ্কার করলেন। রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিগণ বিরাম চিহ্নের প্রয়োগে দ্বিধাভক্ত হলেন—একদল বিরাম চিহ্নের অস্তিত্ব ও কবিতায় বিপুল সম্ভাবনার কথা স্বীকার করলেন; আর সম্প্রতিকালে একদল ফরাসি কাব্যচেতনার আদর্শে কবিতাকে বিরাম চিহ্নের শাসন থেকে মুক্ত করতে এগিয়ে এলেন। আধুনিক কবিদের কাছে বিরাম চিহ্ন শব্দের প্রতিরূপ হিসেবে প্রযুক্ত হতে লাগল। জীবনানন্দ ডেস (—), বিস্ময়চিহ্ন (!), কামাকে (,) দিয়ে রচনা করলেন তাঁর কাব্যশৈলীর স্বকীয়তা। অন্তহীন চলার গতিকে, চলার পথের বাধা বিপত্তকে দ্যোতিত করে তাঁর নির্বাচিত বিরাম চিহ্ন। অস্তি-নাস্তির দ্বন্দ্বকে বিস্ময় (!) ও জিজ্ঞাসা (?) চিহ্নে ধরতে চাইলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। এইভাবে একালে বিরাম চিহ্নও পেল নবতাৎপর্য।

২৩.০

উলঙ্ঘনরীতি আধুনিক কবিরা বিশেষভাবে গ্রহণ করলেন। বিশ শতকের পূর্বে পর্যন্ত এই রীতি বাংলা কবিতার শরীরে সমীভূত হয় নি। আধুনিক কবিগণ আগেকার কবিতার বিবৃতিধর্মের পরিবর্তে ব্যঞ্জনামুখর, সংকেতময়, রহস্যসঞ্চারী করতে এই উলঙ্ঘনকে সচেতন শিল্পকৌশলরূপে চয়ন করলেন। ঘটনাগত সত্যের পরিবর্তে ভাবগত সত্যকে চিত্রিত করার একটি উত্তম শিল্পশৈলী বলে আধুনিক কবিদের কাছে এই রীতি আদৃত। ফলে সীমার মাঝে অসীমের ছোঁয়া, রূপের মধ্যে অরূপের দ্যুতি উদ্ভাসিত হল। আর তারফলে আধুনিক

কবিতা সাধারণ পাঠকের বোধের সীমাকে অতিক্রম করে অন্য জগতের বস্তুতে পরিণত হল। এই নতুন শিল্পকৌশলে কবি নিজস্ব কল্পনালোকের পাশাপাশি পাঠকের কল্পনালোককেও উদ্দীপিত করতে, পাঠকের সঙ্গে একাসনে বসে তার রসাস্বাদন করতে চাইলেন।

২৪.০

বিবৃতির সঙ্গে সংলাপের মিশেলে বাংলা কবিতার আবির্ভাব। এই ধারা আজও সমরূপে প্রবাহিত। তবে প্রাচীন ও মধ্যযুগে এবং আধুনিক আখ্যান কাব্যে নানা ব্যক্তিত্বের হৃদয়ের উত্তাপে সংলাপ ছিল বৈচিত্র্যপূর্ণ ও মুখর। কিন্তু বিশ শতকে কবির ব্যক্তি হৃদয়ের আবেগের আলোড়ন ও বেদনার দহন নীরবে ফুটে উঠল তাতে। মৌনে মুখরিত এর সংলাপ। ভাবালুতা, আবেগোচ্ছ্বাস, অসংহত, অমার্জিত মধ্যযুগীয় সংলাপ বিশ শতকের কবিতায় সুসংহত, মার্জিত, ইঙ্গিতপূর্ণ, তীক্ষ্ণ, শিল্পিত হয়ে উঠেছে। তবে উনিশ শতকে মধুসূদন দত্তের "মেঘনাদবধ" ও "বীরাঙ্গনা" কাব্যে কাব্য-সংলাপে আধুনিক জীবনবোধ ও শিল্পরূপের পরিচয় পাওয়া যায়। নৈঃশব্দের ভাষা আধুনিক কবিতায় এক অচেনা লোকের আভাস এনেছে।

২৫.০

রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিদের কাব্যে "আমি" আত্মগত হয়েও বিশ্বগত হয়ে উঠেছে। তাঁরা আত্মসত্তায় বিশ্বমানবাত্মাকে উপলব্ধি করেছেন। আত্মগত আমিতে আবিষ্কৃত হয়েছে এক অন্যতর আমি, যা কিনা চেতনার দোসর, অন্তর্যামী, জীবনদেবতা, বোধিলব্ধ আমি নামে অবিহিত। রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ সেই আমিতে আত্মমগ্ন। কখনো কখনো নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের মধ্যে সেই আমির চকিতে দেখা মেলে। কিন্তু উনিশ শতক পর্যন্ত আমি সামাজিক গোষ্ঠীচেতনায় নিহিত ছিল, তবে কখনো কখনো তা ব্যক্তিসত্তায় উন্নীত হয়েছিল। আধুনিক কবিতায় 'আমি'র অসম্ভব জটিল প্রকাশ।

২৬.০

প্রাগাধুনিক কবিতা একাধারে সঙ্গীতধর্ম ও কাব্যধর্ম যুক্ত। প্রথম উনবিংশ শতকের সূচনায় কবিতার শরীর থেকে সঙ্গীতধর্ম বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ-অতুলপ্রসাদ-দ্বিজেন্দ্রনাথ-রজনীকান্ত-নজরুল ইসলাম আবার কবিতাতে ফিরিয়ে আনেন এই দুই বৈশিষ্ট্যকে। আবার রবীন্দ্রোত্তর কবিরা সঙ্গীতধর্মকে কবিতার শরীর থেকে আলাদা করে নিলেন। তবে সঙ্গীতের বিভিন্ন প্রকরণকে স্বীকার করলেন। সঙ্গীতের সুর, গতি ও চিত্রময়া ফল্গুধারার মতো আধুনিক কবিতার শরীরে প্রবাহিত।

২৭.০

আধুনিক বাংলা কবিতার বিবর্তনের ধারায় কবিতায় কায়া ও সত্তায় পুষ্টিরস সঞ্চারিত করেছে সাময়িক পত্র-পত্রিকা। ঈশ্বর গুপ্তের 'সম্বাদ প্রভাকর' (১৮৩১) পত্রিকায় যার

প্রাথমিক সূচনা। এখানে তিনি সংবাদপত্রের প্রয়োজনে তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়কে (পাঁঠা, তপশে মাছ, আনারস) অবলম্বন করে যে লঘুরসাত্মক, ব্যঙ্গপ্রবণ ছড়া জাতীয় কবিতা রচনা করেন তার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে ধর্মীয় আবেষ্টনীমুক্ত বস্তুনিষ্ঠ কবিতার সূত্রপাত হল। তিনি "কবিতার লড়াই" সূচনা করে কাব্যজগতে প্রথম গোষ্ঠীচেতনার সূত্রপাত ঘটান। বিচিত্র বিষয়কে বিতর্কের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা দিতে গিয়ে কবিতার ভাব, ভাষা, ধীরে ধীরে পরিশীলিত ও শিল্পগুণ সম্পন্ন হয়ে উঠেছে। বাংলা কাব্যের প্রাণপুরুষ রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তা আশৈশব লালিত হয়েছে পত্রিকার ছত্রছায়ায়। 'সবুজ পত্র' (১৯১৪) প্রথম নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গিতে ভাবাতিরেক আবেগবহুল অসংযত অসংহত অপরিশীলিত কবিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। এই পত্রিকা বাংলা কবিতার সুসংহত, সংস্কৃত, পরিশীলিত, স্বচ্ছ রূপ প্রতিষ্ঠা করতে প্রথম সচেষ্ট হয়। আমাদের দৃষ্টিকে বিশ্বমুখী করে তোলে। কল্লোল (১৯২৩) ও কালি-কলম (১৯২৬), 'প্রগতি' (১৯২৭) পত্রিকাগুলো ইউরোপের নবকাব্যান্দোলনের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে বাংলা কবিতার ধারাকে আমূলভাবে পরিবর্তিত করল। বাস্তববাদ (realism) ও প্রকৃতিবাদের (naturalism) মূলতত্ত্ব ও দর্শন কবিতার ভাববস্তুতে পরিণত করার সক্রিয় প্রচেষ্টা দেখা গেল। কবিতার বিষয় হয়ে উঠলো অ্যান্টিরোমান্টিক, কিছুটা রবীন্দ্রভাবমণ্ডলের পরিপন্থী। ফ্রয়েডীয় লিবিডোতত্ত্ব কাব্যের অঙ্গীভূত বিষয় হয়ে শ্লীল-অশ্লীলের সীমা অতিক্রম করে বাস্তব জীবনাকাঙ্ক্ষাকে স্বীকার করল। রবীন্দ্রনাথের ভাবলোকের কল্পনার ভাবৈশ্বর্যকে সরিয়ে রেখে, মননশীল, যুক্তিনির্ভর বাস্তব সত্যকে প্রতিষ্ঠাদান করল এই পত্রিকা। 'প্রগতি'তে (১৯২৭) যার শুভ আরম্ভ, বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা'তে (১৯৩০), সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'পরিচয়' (১৯৩১) তার স্বকীয় দর্শনের পূর্ণপ্রতিষ্ঠা। সগর্বে সুললিত কাব্যভাষার মনোহারিত্বকে, কোমল স্নিগ্ধ রূপকে পরিহারের কথা সোচ্চারে ঘোষণা করে, মৌখিক ভাষাকে স্থান দিতে আহ্বান জানালেন বুদ্ধদেব বসু। ময়ূখ, কৃত্তিবাস পত্রিকায় পাঁচের দশকের কবিদের আত্মপ্রকাশের হাতিয়ার হয়ে উঠে। পাশ্চাত্য কাব্যাঙ্গিক ও জীবনদর্শন প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এই সমস্ত পত্রিকার প্রাণধর্মে পরিণত হয়। ফলে বাংলা কাব্যে অস্তিবাদ, অধিবাস্তববাদ, প্রকাশবাদ, প্রতীকীবাদ, উত্তরাধুনিকতা ইত্যাদি দর্শনের সত্যের আস্বাদ আমরা লাভ করলাম।

গ্রন্থপঞ্জী : উল্লেখপঞ্জী :

১. দাশ, জীবনানন্দ, কবিতার কথা, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, ফাল্গুন ১৪০৫, পৃ-৭।
২. শ্রীঅরবিন্দ, ভবিষ্যতের কবিতা, (অনুবাদ-ড. রামেশ্বর শ'), শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী, ১৯৯৫।
৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার : বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ণ বুক এজেন্সী, কলকাতা, ১৯৫৬, পৃ-৯।
৪. মেঘনাদবধ-১৯৬১, বীরাঙ্গনা-১৯৬২, তিলোত্তমাসম্ভব-১৮৬০, ব্রজাঙ্গনা-১৯৬০, চতুষ্পদী কবিতাবলী-১৯৬৬।

৫. বৃত্রসংহার-১৮৭৫, ১৮৭৭, বীরবাহু কাব্য-১৮৬৪, আকাশকানন-১৮৭৬, ছায়াময়ী-১৮৮০।
৬. পলাশীর যুদ্ধ-১৮৭৫, অবকাশরঞ্জিনী-১৮৭১, ১৮৭৮, ক্লিওপেট্রা-১৮৭৭, রঙ্গমতী-১৮৮০, রৈবতক-১৮৮৭, কুরুক্ষেত্র-১৮৯৩, প্রভাস-১৮৯৬।
৭. পদ্মিনী উপাখ্যান-১৮৫৮, করমদেবী-১৮৬২, শূরসুন্দরী-১৮৬৮, কাঞ্চীকাবেরী-১৮৭৯।
৮. সঙ্গীতশতক-১৮৭০, বঙ্গসুন্দরী-১৮৭০, নিসর্গ সন্দর্শন-১৮৭০, বন্ধুবিয়োগ-১৮৭০, প্রেম প্রবাহিনী-১৮৭০, সারদামঙ্গল-১৮৭৯, সাধের আসন-১৮।
৯. প্রসূন (১২৯৪), প্রেম ও ফুল (১২৯৪), কুঙ্কুম (১২৯৮), কস্তুরী (১৩০২), চন্দন (১৩ ০৩), ফুলরেণু (১৩০৩), বৈজয়ন্তী (১৩১৩)।
১০. সেন, সুকুমার—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ২০০২, পৃ-২৭৩।
১১. কবিকাহিনী-১৮৭৮, বনফুল-১৮৮০, সন্ধ্যাসঙ্গীত-১৮৮২, প্রভাত সঙ্গীত-১৮৮৩, ছবি ও গান-১৮৮৪, কড়ি ও কোমল-১৮৮৬, মানসী-১৮৯০, সোনার তরী-১৮৯৪, চিত্রা-১৮৯৬, কল্পনা-১৯০০, ক্ষণিকা-১৯০১, নৈবেদ্য-১৯০১, খেয়া-১৯০৬, কথা ও কাহিনী-১৯০৯, উৎসর্গ-১৯১৪, বলাকা-১৯১৬, পলাতকা-১৯১৮, পূরবী-১৯২৫, পরিবেশ-১৯৩২, শেষ সপ্তক-১৯৩৫, বীথিকা-১৯৩৫, পত্রপুট-১৯৩৬, শ্যামলী-১৯৩৬, প্রান্তিক-১৯৩৬, আকাশ প্রদীপ-১৯৩৯, নবজাতক-১৯৪০, সানাই-১৯৪০, রোগশয্যায়-১৯৪০, আরোগ্য-১৯৪১, জন্মদিনে-১৯৪১।
১২. মরীচিকা ১৯২৩, মরুশিখা-১৯২৭, মরুমায়া-১৯৩০, সায়ম্-১৯৪০, ত্রিযমা-১৯৪৮, নিশান্তিকা-১৯৫৭
১৩. অগ্নিবীণা-১৯২২, ব্যথার দান-১৯২১, ছায়ানট-১৯২৩, দোলনাচাঁপা-১৯২৩, বিষের বাঁশী-১৯২৪, ভাঙ্গার গান-১৯২৪, ফণিমনসা-১৯২৪, পূবের হাওয়া-১৯২৫, চিত্তনামা-১৯২৫, সাম্যবাদ-১৯২৫, সর্বহারা-১৯২৬, বুলবুল-১৯২৮, জিঞ্জির-১৯২৮, চোখের চাতক-১৯২৯, চক্রবাক-১৯২৯, সন্ধ্যা-১৯২৯
১৪. স্বপন-পসারী-১৯২২, বিসস্মরণী-১৯২৭, সস্মর-গরল-১৯৩৬, হেমন্ত-গোধূলি-১৯৪১, ছন্দ-চতুষ্কী-১৯৫১।
১৫.
১৬.
১৭. দাশ, জীবনানন্দ : জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, নাভানা, মে ১৯৫৪, ভূমিকা।
১৮. দাশ, জীবনানন্দ : কবিতার কথা, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, ফাল্গুন ১৪০৫।
১৯.
২০. সবিতা-১৯০০, সন্ধিক্ষণ-১৯০৫, বেণু ও বীণা-১৯০৬, হোমশিখা-১৯০৭, তীর্থসলিল-১৯০৮, তীর্থরেণু-১৯১০, ফুলের ফসল-১৯১১, কুহু ও কেকা-১৯১২, চীনের ধূপ-১৯১২, রঙ্গমল্লী-১৯১৩, তুলির লিখন-১৯১৪, মণিমঞ্জুষা-১৯১৫, অভ্র-আবীর-১৯১৬, হসন্তিকা-১৯১৭, বেলা শেষের গান-১৯২৩, বিদায় আরতি-১৯২৪, ধূপের ধোঁয়ায়-১৯২৯
২১. প্রথমা (১৯৩২), সম্রাট (১৯৪০), ফেরারী ফৌজ (১৯৪৮), সাগর থেকে ফেরা (১৯৫৬)
২২. কয়েকটি কবিতা-১৯৩৭, গ্রহণ ও অন্যান্য কবিতা-১৯৪০, নানকথা-১৯৪২, তিনপুরুষ-১৯৪৪
২২. অক্রেষ্টা-১৯৩৫, ক্রন্দসী-১৯৩৭, উত্তরফাল্গুনী-১৯৪০, সংবর্ত-১৯৫৩, দশমী-১৯৫৬

২৩. ঝরাপালক-১৯২৭, ধূসর পাণ্ডুলিপি-১৯৩৬, মহাপৃথিবী-১৯৪৪, সাতটি তারার তিমির-১৯৪৮, বনলতা সেন- রূপসী বাংলা-১৯৫৭।

২৪. উত্তররৈবিক বাংলা কাব্য, কবিতার কথা, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, ৮ম সং. ১৪০৫, পৃ.৩৩।

২৫. উর্বশী ও আর্টেমিস-১৯৩২, চোরাবালি-১৯৩৮, পূর্বলেখ-১৯৪১, সন্দীপের চর-১৯৪৭, অন্বিষ্ট-১৯৫০, নাম রেখেছি কোমল গান্ধার-১৯৫০।

২৬. খসড়া-১৯৩৮, একমুঠো-১৯৩৯, মাটির দেয়াল-১৯৪২, অভিজ্ঞান বসন্ত-১৯৪৩, পারাপার-১৯৫৩, পালা-বদল-১৯৫৫

২৭. ছাড়পত্র-১৩৫৫, পূর্বাভাস-১৩৫৫, ঘুম নেই-১৩৫৫, মিঠে কড়া-১৩৫৮

২৮.

২৯.

৩০. দাশ, জীবনানন্দ : কবিতার কথা, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, ফাল্গুন ১৪০৫, পৃ-৪৮।